

ট্যাক্সিওয়ালা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী



প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ, ১৩৬৩
প্রকাশক
নারায়ণ সেনগুপ্ত
ক্লাসিক প্রেস,
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
প্রচ্ছদ
সুবীর সেন
মুদ্রক
রূপশ্রী প্রেস লিমিটেড
৯, এন্টনী বাগান লেন,
কলিকাতা
পূর্ব পাকিস্তানে প্রাপ্তিস্থান
বই ঘর
ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম

দাম দু'টাকা।

শ্রীসাগরময় ঘোষ
শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
বন্ধুবরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

খেলনা

চার ইয়ার

শালিক কি চড়ুই

বন্ধুপত্নী

সূর্যমুখী

মীরার দুপুর

বারো ঘর এক উঠোন

বিধবা কি সধবা কি করে বুঝব বলুন।

সরু পাড় কি নিপাড় শাদা শাড়ি এখন অনেকেই পরেন। ওটা স্টাইল।

আর চুড়ি না রাখা।

সিঁদুর না পরা।

কি এমনভাবে সিঁদুরের টিপ চুলের অরণ্যে লুকিয়ে থাকবে যে কপালের সঙ্গে কপাল ঠেকালে যদি আপনার মালুম হয় আলপিনের ডগার আঁচড়টি। অনেক সময়ই হয় না।

তাছাড়া মুখখানা প্রায় সব সময়ই বাঁ দিকের পার্টিশন তাক করে ধরে ছিল বলে মেয়েটির সিঁথি নজরেই পড়ছিল না।

চুড়ির বদলে বাঁ কব্জিতে ছোট ছেলেদের মোজার গার্ডারের মত কালো সরু ফিতায় বাঁধা ঘড়ি। ওর তলে রাখা হাতের সাদা ঈষৎ চ্যাপ্টা সরু কব্জির মাথায় তেঁতুল বিচির মত ঘড়িটা দেখতে দেখতে কেন জানি আমি মোটামুটি একটা বয়স আন্দাজ করে ফেললাম। ত্রিশ বত্রিশ? আটাশও হতে পারে।

কি আর একটু কম।

চব্বিশ। বাইশ?

বাইশ হলে খুব কম করে ধরা হত। বস্তুত একদিকে বর্ষার কচি মুলোর মত মসৃণ কোমল কব্জি আবার অন্যদিকে ওর পর মাংসল ভারি পা দুটো বয়েস সম্পর্কে মনে কেমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছিল। তাই হয়। অনেক সময় কোনো মেয়ের চিবুক ও চোয়াল আপনাকে যে বয়সের ইঙ্গিত দেবে গলা বা ঘাড়ের দিকে চোখ রাখা মাত্র আপনার সেই অনুমান মিথ্যা মনে হবে। চিবুকে যদি চব্বিশ বছর বয়স লেখা থাকে ঘাড়ের দিকে তাকানো মাত্র আপনার মনে হবে—না আরো বেশি, বত্রিশ।

এই ক্ষেত্রে আমি সে ধরনের একটা গোলমালে পড়েছিলাম। চেয়ারের তলা দিয়ে মেয়েটির চটি খোলা পায়ের যেখানটায় শাদা লেস পরানো শায়াটা উড় উড় করছিল (বস্তুত এত জোরে ও ফ্যান্ চালিয়ে দিয়েছিল

যে হাওয়ায় তার কামরার ভিতর ঝড় বইছিল) দুবার আমি সে জায়গাটা বেশ ভাল করেই দেখতে পেলাম। তামাটে বেশ শক্ত মতন মাংসের একটা ডেলা। অথচ সেই তুলনায় তার হাতটা অনেক বেশি শুভ্র কোমল কচি মনে হচ্ছিল।

সুতবাং হাত যে বয়স বলছিল, পা বলছিল তার উল্টোটা। কিন্তু তাহলেও আমি পায়ের বয়সটা বাতিল করে দিলাম। কেননা ঝড়ো হাওয়ায় মুহুর্মুহু খোঁপা থেকে আঁচলটা যখন খসে খসে পড়ছিল ওর গলা ও ঘাড়ের সুন্দর কোমল বাঁক ও রেখাগুলি দেখে চব্বিশ পঁচিশের বেশি বয়স হবে না নিশ্চিন্ত হ'তে পারলাম।

আমার এতটা দেখার সুবিধা হত না।

আমি অনেকক্ষণ আগেই চা শেষ ক'রে চুপচাপ বসে ছিলাম। একজন কেউ ভিতরে পর্দা খাটানো কামবায বসে খাচ্ছে হোটেলে (হোটেল-রেস্টুরেণ্ট) পা দিয়েই অনুমান করতে পেরেছিলাম। পর্দার ওপারে একজন আছে কি দু'জন আছে প্রথমটায় অবশ্য ঠিক ধরতে পারিনি। এবং ধরতে না পারাটা কাজের কথা নয়,—কোনো বুদ্ধিমান যুবকই মেয়েটি একলা এসেছেন না সঙ্গে অন্য লোক আছে, না জানা পর্যন্ত নিশ্চেষ্ট থাকেন না।

আমি চেয়ারটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে পর্দার দিকে চোখ রেখে এপারে বসে আর একটা কিছুর অর্ডার দিতে তৈরি হতে লাগলাম।

পুরুষ খদ্দেরের গলার শব্দ শুনে কিনা ঈশ্বর জানেন, ও-ঘরের পাখা হঠাৎ বেগবতী হয়ে উঠল। তারপর তো পর্দা কতবার উঠল কতবার নড়ল, কতবার দরজা থেকে তা সরে সরে গেল৭ ভিতরের হুকুম পেয়ে কিনা বোঝা গেল না যে-ছেলেটা আর একবার ভাত নিয়ে সেদিকে যাচ্ছিল পর্দাটা দলা পাকিয়ে পার্টিশনের মাথায় তুলে দিলে।

ভাতের পর দেখলাম আবার ডালের বাটি গেল, একদলা আলু সিদ্ধ।

ডিম মাংস কালিয়া কোর্মা দো-পেঁয়াজি ইলিশ-ভাতের গন্ধে চারদিক ম ম করছিল। চপ কটলেট গ্রীল মোগলাই পরটার অর্ডার পড়ছে অন্যদিকে। বেশ বড় রেস্টুরেণ্ট

কিন্তু সেই ডিশে ও কামরায় ডাল আর আলু ছাড়া অন্ত কিছুপ্রবেশ করল না লক্ষ্য ক'রে সচকিত হয়ে উঠলাম।

এটা অবশ্য কাজের কথা নয়।

অবস্থা ও রুচিভেদে এক একজন এক একরকম খাওয়া পছন্দ করে। একটা আস্ত সিগারেট শেষ ক'রে আমি একটা চিংড়ি কটলেট-এর অর্ডার দিলাম। সামনের কামরায় একটি মেয়ে খাচ্ছে আর সেদিকে হা ক'রে তাকিয়ে থেকে একটা চেয়ার দখল করে এমনি বসে থাকাটা অশোভন। কাজেই অতিরিক্ত খরচে নামা গেল।

ছেলেটাকে ডাকলাম।

যে উদ্দেশ্যে গলা বড় ক'রে আমি ছেলেটাকে ডাকছিলাম তাও চরিতার্থ হল। পর পর দু'বার ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটি এদিকে তাকায় ও আমাকে দেখে।

একটি মেয়ে সম্পর্কে আমি এতটা উৎসুক কেন, আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ভাবছেন লোকটা অভদ্র ইতর।

আসলে কিন্তু আমি তা না। আমি ট্যাক্সি চালাই। যারা ট্যাক্সি চালায় তারা সব সময়ই চোখ কান সজাগ রাখে। কে কখন ডাকে, কার কখন হঠাৎ ট্যাক্সির দরকার হয় তার ঠিক আছে কিছু!

হ্যাঁ, আমার প্রথমেই মনে হল যেন খাওয়া সেরেই মেয়েটি নিশ্চয় গাড়ি ঘোড়া কিছু একটা ডাকবে।

আপনারা ঠোঁট টিপে হাসছেন।

কিন্তু এটা তো সত্য, যে নিত্য যাত্রী পারাপার করে, কার কখন গাড়ির দরকার হবে রাস্তায় ঘাটে লোকের চোখ মুখ দেখলে আপনাদের চেয়ে সে একটু আগে বুঝতে পারে।

হ্যাঁ, আট বছর আমি কলকাতা শহরে ট্যাক্সি চালাই। আমার নিজের গাড়ি।

গাড়ি কিনে আমি এই ব্যবসা করছি ঠিক তা না কিন্তু।

বরং গাড়ি চড়ে দিব্যি হাওয়া খাওয়া যাবে এই মতলবে গাড়ি কেনা হয়েছিল। হাম্বার। এক নম্বরের গাড়ি এটা, মশাই, আমার।

হ্যাঁ, ওতে চড়ে হাওয়া খাওয়ার মতলবটা আমার চেয়ে আমার বাবার বেশি ছিল।

কিন্তু কেনার এক বছর পরে বাবা মারা যান।

তার পরের বছর আমাদের দেশ ভাগ হয়। অর্থাৎ পাকিস্তানের ছোটখাট জমিদারীটা গেল।

ফতুর, আমি তখন ফতুর। জমানো টাকা কিছুই প্রায় ছিল না। জমিদারীতে ক'বছর ধরেই ঘুণ ধরেছিল।

আর কি, গাড়িখানা সম্বল ক'রে আমার স্ত্রী রমার হাত ধরে হিন্দুস্থান, মানে কলকাতায় বড়মামার বাসায় এসে উঠলাম।

হুঁ, একডালিয়া রোডে।

গাড়িটা এবং বলতে সঙ্কোচ নেই, রমাও প্রায় নতুনই ছিল। গাড়ি কেনার ছ' মাস আগে তো আমি বিয়ে করেছিলাম।

যাক্‌গে, এখন জমিদার-নন্দন চাকুরে মামার ঘাড়ে চেপে তার অন্নধ্বংস করবে তা-ও একলা না সস্ত্রীক, অত্যন্ত নিন্দনীয়। বুঝলাম।

তাছাড়া মামা পারতেনও না।

বুদ্ধি করে বৌকে মামাশ্বশুরের জিম্মায় রেখে আমি গাড়িটা নিয়ে রাস্তায় বেরোলাম।

হুঁ, ট্যাক্সির লাইসেন্স নিয়ে (অবশ্য সরকারী চাকুরে আমার মামাই তদ্বির টদ্বির করিয়ে চট্‌ ক'রে লাইসেন্সটা বার করতে সাহায্য করলেন) বেশ দু' পয়সা কামাতে লাগলাম।

চাকরি, বিশেষ ক'রে অফিসের লেখা-পড়ার কাজের বিদ্যা মশাই, আমার ছিল না বলে রাখছি—জমিদারের বাচ্চা, দুধের সর আর মাছের পেট খেয়ে প্রজাদেব চোখ রাঙিয়ে জমিদারী চালাব এই স্বপ্ন নিয়েই বড় হয়েছিলাম। তা সে সুখ তো কপালে রইল না।

হুঁ, আমি ও আমার গাড়ি যখন দিবারাত্র কলকাতা শহর চষতে লাগলাম আর একজন কিছু দূরে একডালিয়া রোডে চুপ করে বসে রইল না। রমা।

পাকিস্তান থেকে সে-ও নতুন এসেছে তাজ্জব শহরে। গাড়িটা যদি একডালিয়া রোডের বাসায় এমনি পড়ে থাকত তো আমার মামা বিকাশ রায়ের বড় মেয়ে টুনি (ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন) ওটাকে ব্যবহার করত। সে কি এক আধবার। দিনের মধ্যে বিশ বার। সে-বাড়ি উঠেই দু'এক দিনের মধ্যে আমি টের পেয়েছিলাম। নতুন কলেজী হাওয়া গায়ে লেগেছে টুনির। তার ওপর চেহারাখানাও মিষ্টি মতন। তায় আবার সবে লাগছিল ষোলটা বসন্তের হাওয়া। মশাই, ও কি আর ওর মধ্যে ছিল। টুনি বন্ধুদের সঙ্গেই দেখা আর শেষ করে উঠতে পারছিল না।

অবশ্য বিকাশবাবু চেষ্টা করেছিলেন অনেক দিন থেকেই গাড়ি কিনতে। তা, সে কি আর চাকুরে লোকের পক্ষে চট্ ক'রে হয় মশাই, তা-ও এই গ্রেডে থেকে।

কাজেই বুঝতে পারছেন টুনি গাড়িটা একবার বাড়ির মধ্যে পেয়ে প্রাণখুলে বেড়াতে শুরু করেছিল। ওটাকে আমার সঙ্গে না নিয়ে এলে কী অবস্থাটা হত?

গাড়ি রেহাই পেল, কিন্তু রমা রেহাই পায়নি। মফঃস্বল থেকে নতুন মেয়ে এসেছে। তা-ও একডালিয়া রোডের মত ফ্যাশানেবল পাড়ায়। তার ওপর রমার চেহারা ওপাড়ার অনেক মেয়ের চেয়েই ভাল,—আর এই তো সবে বিয়ে হয়েছে, এখনো ইয়ে—

'বৌদি বৌদি।'

হ্যাঁ, বিকাশ রায়ের বড় ছেলে বেণু রায়। কী পাজি মশাই, যদি দেখতেন। এমনি মুখ দেখলে মনে হবে সাত চড়ে রা বেরোয় না। ভাজা মাছ উল্টে খেতে শেখেনি। আর এদিকে তলে তলে হাড়বদমায়েস।

'বৌদি বৌদি।'

ঐ যে বললাম। টুনি করত আমার গাড়িটার সদ্ব্যবহার, আর বেণু হারামজাদা করতে লাগল আমার স্ত্রী রমাকে ব্যবহার। হ্যাঁ, ঐ যথার্থ শব্দ। বৌদি না হলে চা-খাওয়া হয় না, বাবুর বিছানা ঠিক থাকেনা, বৌদি টেবিলের বই গুছিয়ে না রাখলে গোছানো হয় না, ধোবার কাপড় এলে সেগুলো সুটকেসে তুলতে ও দরকার মত একটা একটা করে বার করে দিতে বৌদি। ভাত খেয়ে উঠে বৌদির হাতের মুখশুদ্ধি মশলা মিষ্টি। বাথরুমে যেতে তোয়ালে সাবানের জন্যে বৌদির ডাক।

কেন হবে না মশাই!

রাতদিন দেখছিল সমর্থ সব মেয়ে।

সমর্থ মেয়েরা বেছে বেছে সমর্থ পুরুষকে পাকড়াও করছে। একত্র বেড়ানো, একসঙ্গে সিনেমা দেখা।

আমি তো আগেও কোলকাতায় এসেছি। কিন্তু হালে, পাকিস্তান ছেড়ে এসে এবার রকম সকম দেখে বুদ্ধি লোপ। আর একডালিয়া রোডের মত বাবুপাড়া। অবাধ মেলামেশার যেন বান ডাকছিল।

কিন্তু আমাদের সোনার চাঁদ বেণু সুবিধে করতে পারছিল না। বাপের অবস্থা তো আর দশটি ছেলের বাপের মতন না। বুঝতে পারছেন। রাজা জমিদারের মত অবস্থার ঘরের ছেলের সংখ্যা সেখানে অনেক।

আর লুটছিল সব তারাই।

গাড়ি আছে, বাড়ি আছে হাতে দুটো তিনটে করে হীরে চুনীর আংটি সব ছেলে।

মশাই, কায়দা করে বাবা বনেদী পাড়ায় বড়মানুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাড়া করা ফ্ল্যাটে থাকছিল বটে।

কিন্তু চারদিকের অবস্থা যে অন্যরকম। ছেলে মেয়ে দুটোরই উপোসে কাটছিল। টুনি পাচ্ছিল না একটা গাড়ি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। আহা কী সব বন্ধু। হাতিবাগান না সিমলা ষ্ট্রীট থেকে একদিন একটা ছেলে গিয়েছিল ওবাড়ি। ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, গায়ে কাঁধছেঁড়া ময়লা পাঞ্জাবী। শুনলাম ঐ নাকি টুনির লেটেষ্ট। তা যেমন অবস্থার ঘরের মেয়ে এর চেয়ে ভাল ছেলে ও যোগাড় করতে পারত কি ?

আর এদিকে ভুগছিলেন বেণুবাবু।

নতুন গোঁফ কামাচ্ছেন। কলেজে একটা পাশ দিয়েছেন। আদ্দি মলমলটা যে গায়ে না উঠছে তা নয়, পায়ে হরিণ চামড়ার চটি, বোতামের গর্তে একটা দুটো গোলাপ ফুলও মাঝে মাঝে গোঁজা হয় এবং মাথায় একটু আধটু গন্ধ তেল। কিন্তু ঐ। এর বেশি না। পকেটে পার্স আর ক'টাকা নিয়ে চলাফেরা করতেন সাব-ডেপুটির ছেলে ? এই বিত্ত নিয়ে ওখানকার মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করা ! আমার তো মনে হয় কারো চুলের ডগাটি ও ছুঁতে পারেনি ওপাড়ায়।

তার শোধ তুলল সে রমার ওপর। হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। আত্মীয়াও বটে, নারী তো বটেই। আঠারো বছর বয়েসে সবে পা দিয়েছিল রমা। আর, বেণু ওকে পেলে কোথায়,—রাস্তায় ঘাটে না, বাড়িতে, ঘরে, একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে।

'বৌদি বৌদি।'

মানে উপোসী বাঘ হরিণের সাক্ষাৎ পেল। কি, আমি খুব বেশি দোষ দিই না রমার। কি আর তেমন বুদ্ধিশুদ্ধি হবে ওই বয়সে, পাড়াগাঁয়ে থেকে লেখাপড়া শিখে চোখমুখ ফুটবে তারও খুব একটা সুযোগ পায়নি। আদুরে

বাপের মেয়ে মাঘমণ্ডল ব্রত করে আর দেয়ালির রাতে হাজার বাতি ও রংমশাল জালিয়ে বড় হতে না হতে টুপ করে একদিন বিয়ে হয়ে গেল।

তাছাড়াও একটা শয়তান যদি একটি মেয়ের মুখের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নিশ্বাস ফেলতে থাকে—

একডালিয়া রোডের বাড়ির শোবার ঘরে, বাথরুমে, বাগানে, ছাদে আধখানা মাথা নষ্ট হয়েছিল রমার। বাকি আধখানা হল বাইরে রেষ্টুরেণ্টে, হোটেলে এবং আর কোথায় কোথায় বেণু ওকে নিয়ে গিয়েছিল জানি না। এদিকে আমাকে থাকতে হচ্ছিল বাইরে বাইরে গাড়ি নিয়ে রোজগারের ধান্দায়। টের পাইনি। কিন্তু যখন টের পেলাম তখন সব শেষ হয়ে গেছে। না, একটা সান্ত্বনা থাকত যদি বেণু ওকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোথাও ঘর-সংসার পাততো—কিন্তু তা সে করেনি, করার ইচ্ছাও ছিল না। হয়তো এসব রেওয়াজ এই শহরে আজকাল উঠে গেছে। একডালিয়া রোডের বাসায় যাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। দরকার ছিল না। রমাও সেখানে ছিল না জানতাম। নারকেলডাঙ্গার কাছাকাছি একটা টিনের শেড ভাড়া করে আমি আমার ট্যাক্সি নিয়ে থাকি। তখনই একদিন খবর পেয়েছিলাম রমা নাকি ধর্মতলার কোন একটা বার-এ মদ খেয়ে এক রাত্রে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। বেণু রায়? না, সঙ্গিনী নিয়ে শুঁড়িখানায় বসে ফুর্তি করার পয়সা তার ছিল না। হাত বদল হয়ে হয়েই রমা সেদিন কার কাছে গিয়ে পড়েছিল। তারপর বেশ কিছুদিন আর আমার স্ত্রী সম্পর্কে কেউ কোন সংবাদ দেয়নি।

তারপর বছর তিন বাদে সংবাদ পেলাম দেরাদুন না কোথাকার হাসপাতালে আড়াই মাস একটা পচা ঘা নিয়ে শুয়ে থেকে তারপর রমা শেষ নিশ্বাস ফেলেছে।

শুনে আমিও শান্তির নিশ্বাস ফেললাম।

তারপর, তারপর আমি নারকেলডাঙ্গা থেকে উঠে এসে সার্কুলার রোড ও শেয়ালদার কাছাকাছি একটা জায়গায় একটা টালির শেড ভাড়া করে গাড়ি নিয়ে আছি, হুঁ তেমনি ট্যাক্সিড্রাইভার। তবে রোজগার এখন বেড়েছে। বেড়েছে মানে বেশ বেড়েছে।

না, পূর্ব পরিচয় দিলাম এই জন্যে যে আমার ওপর দিয়ে, হ্যাঁ ভাগ্যের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে।

আপনারা শুনলে হাসবেন।

হাসবেন এবং দুঃখও করবেন।

এবং এটা খুবই সত্য যে লোকে বলে যে, ঈশ্বর একদিকে কেড়ে নিলে আর একদিক দিয়ে দেয়।

স্ত্রী, জমিদারী গেছে। দেশ গেছে। কিন্তু যেমন দিনকাল। খুব একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে যে আজ এই শহরে আমাকে থাকতে না হত তার বিশ্বাস ছিল কি? হ্যাঁ, আমি টাকা পয়সার কথাই বলছি। দিব্যি আছি। সুখই বলা যায়। আমি, দেখুন ইচ্ছা করলে, রোজ এক বোতল বিয়ার খেতে পারি। দুপুরবেলা আস্তানায় ফিরে গিয়ে সসপ্যানে করে আলুসিদ্ধ ভাত রান্না করে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শেয়ালদা কি ধর্মতলার কোন হোটেলে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা খরচ করে এখন মাংস ভাত চালাই। তবে একটু রয়ে-সয়ে খাওয়া দাওয়া করি আর মদটদও পারতপক্ষে অভ্যাসে আনতে চাই না। আমার পেটের ধাত ছোটবেলা থেকেই একটু খারাপ। লিভারের জোর কম।

তার সুবিধা হল এই যে, অপব্যয় না করার ফলে দু'চার হাজার টাকা আমি যখন তখন বার করে দিতে পারি। একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছি ব্যাঙ্কে। খাই-খরচা বাদ দিয়ে যে টাকাটা বাঁচে ওখানেই ফেলে রাখি।

এতক্ষণ পর নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পারছেন আমি অত লোলুপ দৃষ্টিতে কেন বারবার মেয়েটিকে দেখছি। খাওয়া দেখছিলাম।

হ্যাঁ, কখন খাওয়া শেষ হবে আর বেরিয়ে এসে আমার গাড়িতে উঠবে। আরো ক'টা টাকা পাব। ড্রাইভাররা, বিশেষ করে যারা ট্যাক্সি চালায়, তাদের চিন্তাটা সাধরণত এখাতেই বয়। অন্তত প্রথম বইতে শুরু করে।—আর তা ছাড়াও আমি গোপন করব না, মেয়েটিকে যখন দেখছিলাম তখন তার হাত, পা, পিঠ, কাঁধ, চুল, গায়ের রং এমন কি কোমরে কতটা মাংস নেই আর বুকে কতটা মাংস বেশি আছে দু'চোখ দিয়ে জরীপ করলাম, দূর থেকে যতটা সম্ভব।

হাওয়ার দাপটে যখন খোপা থেকে আঁচলটা পিঠে নামল ও পরে পিঠ থেকে সরে গিয়ে আর একটা কাঁধের কাছে উড়্ উড়্ করে তখন আমি তার এ-কাঁধটা দেখতে পাই, বুকের এপাশের সুগোল মসৃণতা। তারপরেই অবশ্য ধীরে সুস্থে একটা কাট্‌লেটের অর্ডার দিই। না হলে আর এই গরমে আমার কট্‌লেট খাওয়ার ইচ্ছা—

কেননা এ-কাঁধের কাপড় সামলাতে এদিকে ও ঘাড় ফেরাতে আমার চোখের সঙ্গে ওর চোখ বেঁধে গেল। ঐ এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যেই বুঝে নিতে পারলাম গাড়ির দরকার হবে।

কট্‌লেট শেষ করে আর একটা সিগারেট ধরাই।

ব্যক্তিগতভাবে আমার যে খুব একটা লোভ হচ্ছিল বৌটিকে দেখে, তা না।

তাছাড়া, নিজের স্ত্রী, রমার কাছে কামড় খাওয়ার পর স্ত্রীলোকদের আমি একটু এড়িয়েই চলি। বেশ আছি একলা আমার টিনের শেড-এ। খাই-দাই ফুর্তি করি। তা না, জমিদারের ছেলে, দেশের অনেক বড়লোক বন্ধু পেয়ে গেছি এখন এই শহরে। হয়তো অনেকে আগে বড়লোক ছিল না, এখন হয়েছে, নিজেদের চেষ্টা, বুদ্ধি ও ভাগ্যের জোরে। ব্যবসাকেন্দ্রে আমার আনাগোনা একটু বেশি। তাঁদের আমাকে একটু সহানুভূতি করাও বটে। তাঁরা ডাকছেন, তাদের ছেলেমেয়েরা ডাকছেন, আত্মীয় এবং বন্ধুরা দরকার হলেই আমার গাড়ি ভাড়া করেন। বালিগঞ্জ থেকে ভবানিপুর, ভবানিপুর থেকে গড়পাড়, গড়পাড় থেকে নতুন বাবুপাড়া লিন্‌টন ষ্ট্রীট, সেখান থেকে সোজা পার্ক ষ্ট্রীট এবং সেখান থেকে বেরিয়ে ডালৌসী, কি চৌরঙ্গি কি ধরমতলা। পুরুষ—আমি আপনাদের কাছে যখন কিছুই গোপন করব না তখন বলে রাখি, পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই আমাকে বেশি ডাকে। তাই বলছিলাম, ভগবান আমার একদিক নিয়েছেন আর একদিক পূরণ করেছেন। এক এক সময় ভাবি, এক কালে জমিদার ছিলাম, আমার চেহারায়, চলায় বলায় তার পরিচয় এখনো একটু আধটু লেগে আছে বলে কি তারা আমার ট্যাক্সিতে চাপতে পছন্দ করেন! আমিও আমার চেহারা এবং পোষাক যতটা সম্ভব সুন্দর সুদৃশ্য রাখতে চেষ্টা করি এবং ফি মাসে গাড়িটার রং ফিরিয়ে ওটাকে তকতকে ঝকঝকে রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করি না। কেন তা করব না বলুন, আর দশটা ট্যাক্সিও যদি পর পর দাঁড়িয়ে থাকে, বালিগঞ্জের সেই সুন্দরী মেয়েটি, কি যেন নাম—উমা সেন, হাত তুলে ঠিক আমাকেই ডাকবে। লিন্‌টন ষ্ট্রীটের সেই রূপসী বৌ, রুবি রায়—যদি কষ্ট করে একটু হেঁটে এসেও আমার গাড়ি ধরতে হয় তো তা করতে সে ভ্রূক্ষেপ করে না। রাস্তায় আর পাঁচটা ট্যাক্সিওয়ালা বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে শুধু দেখে। গড়পাড়ের অসীমা চ্যাটার্জি, পদ্মপুকুরের তৃপ্তি চৌধুরী, মোহনবাগান ষ্ট্রীটের মালা রায়, পার্ক সার্কাসের চামেলী, শোভাবাজারের সুমিতা এবং আরও একশটি মেয়ের বাড়ির

নম্বর আমার মুখস্থ। বাড়ির নম্বর এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে (যদি কেউ অফিসে কাজ করে তো সেই অফিস এবং সেখান থেকে বেরিয়ে যেখানে যায়) যেখানে যাবে সেই ঠিকানা আমি জানি। মাফ করবেন, আপনি যদি স্ত্রী পুত্র কন্যার হাত ধরে লটবহর নিয়ে হঠাৎ শেয়ালদায় ট্রেন ধরতে কি কাঁকুড়গাছি কোন আত্মীয়ের বাড়ি পৌঁছে দিতে আমায় ডাকেন, আমি দু'হাত তুলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব। সময় নেই। আজ শনিবারের দুপুর, সোওয়া বারোটা বাজে, ঠিক একটায় ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটের লাল অফিস-বাড়িটার সামনে আমাকে ট্যাক্সি নিয়ে হাজির থাকতে হবে। সেই অফিসের রেবা সোমকে আমায় শেযালদার একটা হোটেলে পৌঁছে দিতে হবে। আজ রোববার, উঁহু তিনটে বেজে গেছে, এখনই আমাকে গাড়ি নিয়ে ছুটে যেতে হবে সাদার্ণ এভিন্যু। ঝাউ গাছের আড়াল করা সেই আকাশী রঙের বাড়ির সপ্তমী বোসকে পৌঁছে দিতে হবে সৈয়দ আমীর আলী এভিন্যুর একটা সুন্দর ফ্লাট বাড়িতে। সোমবারের সকাল, সময় নেই, মধু বোস লেনের মায়া গাঙ্গুলি আমার ট্যাক্সিতে চেপে টালিগঞ্জের একটা বাড়িতে যাচ্ছে। সেখান থেকে আবার সন্ধ্যা সাতটায় সেই মায়াকে নিয়ে ধর্মতলায় যেতে হবে।

হ্যাঁ, সব ঠিক করা আছে। সময়, স্থান, লোক ও পথের দূরত্ব। ঘড়ির কাঁটা ধরে ধরে আমার সে সব জায়গায় উপস্থিত থাকতে হয়।

তাই বলছিলাম, হরিদ্বার কুম্ভমেলায় যাবেন মনে মনে ঠিক করে যদি হঠাৎ আপনার বুড়ি দিদিমা একদিন হাওড়ার মেল ধরতে চাকর পাঠিয়ে আমার ট্যাক্সি ভাড়া করতে চান তো তিনি নিরাশ হবেন।

অবশ্য মিষ্টি বাক্য বলেই আমি আপনাদের চাকরকে ফিরিয়ে দেব আর আপনার দিদিমার জন্য মনে মনে কষ্টও করব, কিন্তু আপনারা শুনে হাসবেন আজ অবধি কোন বর্ষিয়সীই আমার গাড়িতে চাপল না। তখন, তখন হয়তো আমি আমার সাদা কালো হাম্বাব নিয়ে লিন্টন স্ট্রীটে যেতে তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খেয়ে তৈরী হতে আপনাদের পাড়ার রেষ্টুরেন্টের সামনে গাড়িটা থামিয়েছি। আর আপনার চাকরটাকে ফিরিয়ে দিয়ে দোকানে বসে চায়ের বাটি সামনে নিয়ে আমি একটি তরুণীকে দেখছি। বনানীকে। তার ফর্সা সুগঠিত দু'টি বাহু, শক্ত মজবুত খোঁপা এবং ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ উদ্ধত নাক। ট্যাক্সি নিয়ে যেতে দেরী হলে সেই নাকের ঘায়ে ও আমাকে কচুকাটা

করে দিতে চাইবে। ছবিটা ভাবছিলাম। গোলাপী রং করা গোল প্যাটানের বাড়ির অসামান্য, সুন্দরী মেয়ে। কলেজে পড়ে। বনানী সেন।

এবং বনানীর মত সবাই দেখতে ভাল। হ্যাঁ, যারা আমার গাড়িতে চাপে। সব মেয়ে, সব বৌ।

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে আমি যখন পাশে চুপ করে দাঁড়াই তখন দেখি তাদের চুল দেখি চোখের পালক দেখি ঘাড়ের বাঁক দেখি পিঠ দেখি কোমর। গাড়িতে উঠতে কি নামতে যদি কোন মেয়ের শায়া বা শাড়ি একটু বেশী সরে বা উঠে যায় তো আমি পায়ের রং মাংসল ডিম এমন কি রোমকূপগুলি পর্যন্ত সতর্ক সূক্ষ্ম দৃষ্টি বুলিয়ে চট্ করে দেখে নিই। প্রশ্ন করবেন, কেন? অভ্যাস। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ওপর ওপর দেখা। নখ চুল আঙুল পালক মাংস চামড়া ছাড়া আর কিছু দেখা আমার ইচ্ছাও নেই সময়ও হয় না।

মন?

তাই বলছিলাম ওদের ওদিকটা আমি মাড়াই না। যতদূর সম্ভব চোখ বুজে থাকি, এড়িয়ে যাই। নাহলে বনানী কেন আমার ট্যাক্সি যথাসময়ে ওর দরজায় হাজির না থাকলে রাগ করে, বালিগঞ্জের বৌটি মূর্চ্ছা যায়, টালিগঞ্জের মেয়েটি চোখে-মুখে অন্ধকার দেখে, আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হয় তার কিছু কিছুটা আমি জানি। কিন্তু জেনে করব কি। আমি যে আগেই আর একজনের কাছে ছোবল খেয়ে আছি।

চুপ থাকি। চোখ বুজে যাই। মিটার মিলিয়ে পয়সা আদায় ক'রে আর এক সেকেণ্ড কোথাও দাঁড়াই না। আর এক পাড়ায় ক্ষেপ দিতে শহরের রৌদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বরং মন-টন না দেখে আর দশজন ট্যাক্সিওয়ালার মত নিস্পৃহ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকাটাই নিরাপদ মনে করি। পৃথিবীতে বোধ করি একমাত্র ট্যাক্সিওয়ালারাই এত কাছে এসে এত নিরাসক্ত চোখে নারীর রূপ দেখে। তাই তাদের হা করে তাকিয়ে দেখাটাও বাড়ির 'জেনানারা' কোনোদিন আপত্তি করে না!

আমরা ট্যাক্সিওয়ালারাও সিগারেট মুখে গুঁজে সেই অগাধ রূপের ওঠা-নামা দেখার নেশায় বুঁদ হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ষ্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে যাই। এর বেশি কিছু আমাদের দরকার হয় না।

আর, তা ছাড়াও, আমি ধরুন এখন যেমন, অভদ্রভাবে টেবিল থেকে চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে বার বার খাবার প্লেট থেকে থুঁতনিটা তুলে বৌটির খাওয়া দেখছিলাম, এমন করার সুযোগ আপনারা সেখানে পেতেন না।

রেষ্টুরেণ্টওয়ালাই আপত্তি তুলে বলত, মশাই, বেরিয়ে যান। এটা ভদ্রলোকদের জায়গা। এমন ভাবে তাকানো—

সেই স্বাধীনতা আমার ছিল।

সেই সুখ। আর আপনাদের এখন বুঝতে নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে না, রোজ অন্তত দেড় ডজন মেয়ের রঙীন শাড়ি শায়া ব্লাউজ অবিশ্বাস্য রকমের সব সুন্দর খোঁপা বেণী, চোখ, চোখের রং ও হাসি কান্না দেখে আমি নিজের স্ত্রী-বিচ্ছেদের কথা একেবারে ভুলতে পেরে ট্যাক্সিওয়ালার জীবন কায়মনে আঁকড়ে ধরে আছি। বেশ আছি।

হ্যাঁ, কি যেন বলতে যাচ্ছি—খুঁটিয়ে বৌটিকে দেখছি। নিশ্চিন্ত মনে। তা ছাড়া এইমাত্র হঠাৎ একটা ভিড় হয়ে রেষ্টুরেণ্ট আবার পাতলা ফাঁকা হয়ে গেছে। কোলকাতা শহরেব হোটেল রেষ্টুরেণ্টের দস্তুর যা। কোথা থেকে সব লোক ছুটে আসে আবার একসঙ্গে সব অদৃশ্য হয়ে যায। একটিও থাকে না।

আমি দৃশ্যটা তাই উপভোগ কবব বলে চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে বসি। খাওয়া দেখি। ছোট ছোট হা। শাদা মুখ শাদা ব্লাউজ। শাদা পাড় ছাড়া কাপড়। একটা শ্বেতপাথরের পুতুলের মত লাগছিল। পুতুল খাচ্ছে।

তা ছাড়া ওর উল্টো দিকের দেযালের রংটা পাকা সবুজ। তার ওপর এই দিনের বেলায়ও মাথাব ওপব বত্রিশটা বাল্ব জ্বলছে। শরীরের একটা শাদা ছায়া পড়েছিল সামনে টেবিলের কাচে। শরীরটা ছোট। নুয়ে খাওয়ার সময় ছায়াটা আবো ছোট হয়ে টেবিলে পোর্সেলিনের শাদা ডিশটার সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছিল এক এক বার।

এবার পাযের দিকে চোখ পডতে দেখলাম শাড়ির আঁচলটা সরে গিয়ে শায়ার খানিকটা বেবিয়ে আছে। ঘোর লাল রং। এখন বুঝলাম হাতের মত পা দুটোও খুব ফর্শা। শাযার লালচে আভা লেগে পায়ের মাংস বাদামি রং ধরে আছে। বয়সের রং না ওটা।

মানে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারলাম, হাত পা আঙুল গলা নাক ভুরু চুল চোখ সব নতুন। একেবারে টাটকা, তাজা। যেন এইমাত্র বাক্স থেকে

(বা ঘর থেকে যা-ই বলুন) বেরিয়ে রাস্তায় এসেছে। একলা রেষ্টুরেন্টে বসে খাচ্ছে।

এক গ্লাস জল দিতে ডাকলাম ছেলেটাকে।

জল খেয়ে মেরুদাঁড়া টান ক'রে সোজা হয়ে বসলাম।

মেয়েটিও সোজা হয়ে বসেছে। জল খাচ্ছে। ওপরের দিকে ওর থুঁতনি। আঁচলাটা আর খোঁপা বা ঘাড়ে লেগে নেই সরে গিয়ে বাঁ বগলের তলায় উড়ু উড়ু করছিল, ফলে সবটা পিঠ এখন দেখা যাচ্ছিল। আহা, কী পীঠ! যেন ঈশ্বর নিজের হাতে বাটালি চালিয়ে খোদাই করে সেই পিঠ তৈরী করেছে, তারপর ওতে রঁাদা চালিয়েছে।

মেয়েরা খুব পাতলা ব্লাউজ পরে। ব্লাউজের তলায় বডিজের ফিতে দুটো কড়া হয়ে চোখে পড়ে। যেন ওটা দেখানোর জন্যই ওপরের জামাটা। কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম দেখে খুশি হলাম। বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, টালা গড়পার এন্টালি পার্কসার্কাস-এর এত মেয়েকে আমি রোজ বয়ে বেড়াই! এমন রেখে-ঢেকে জামা পরতে আর কাউকে দেখিনি। অথচ এতে যে তার পিঠের লাবণ্য মাংসের ছোট নরম ঢেউগুলো বোঝা যাচ্ছিল না তা-ও না। শাদা ষ্ট্রাপ দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। এখন দেখলেই মনে হয় শরীরের কোথাও বুঝি অপারেশন হয়েছে। ওটা ব্যাণ্ডেজ। বাদুড়-বাগানের শ্যামলী, সাদার্ন এভিন্যুব রেখা, লিনটন ষ্ট্রীটের বনানী, সুরাবর্দী এভিন্যুর শোভা সোম সব, সব এক। আমি, যদি কোন সময় কাপড় সরেও যায়, ওদের পিঠের দিকে তাকাই না। চোখ ফিরিয়ে নিই। কিন্তু, গোপন করে লাভ নেই, আমার যেন ইচ্ছে হচ্ছিল এখন এখানে এই মেয়েটির পিঠটা একবার ছুঁয়ে দেখি।

অবশ্য আমাদের ট্যাক্সিওয়ালার জীবনে তার সুযোগ কম। পিঠ ধরব কি ভাল করে ওদের সঙ্গে কথাই বলা যায় না। 'রোক্‌কে' 'জোর্‌সে চালাও' 'আ গিয়া' আর তারপর 'কত উঠল মিটারে?' ইত্যাদি একটা দুটো প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া ছাড়া জেনানাদের সঙ্গে ক'টা আর কথা হয়।

আর তাঁরা এত ব্যস্ত থাকেন এক একজন।

আমরা ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েই খালাস। কেবল রাস্তার ক'মিনিটের সম্পর্ক।

কেবল সেদিন, আমার এখানে এই সাত বছরের জীবনে বকুলবাগান ষ্ট্রীটের একটি বৌয়ের হাত ধরেছিলাম। ভারি নরম হাত। বৌটি তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে ফুটবোর্ড থেকে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল।

আর কোনদিন দেখিনি আমার ট্যাক্সিতে উঠতে। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি করছিল।

এখন বৌটি স্বামীর বাড়ি থেকে ভরদুপুরে পালিয়ে হাজরার মোড়ের একটা বাড়িতে একটি ছেলের সঙ্গে যে প্রেম করছিল আমি এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম।

হ্যাঁ, হর্ন শুনে যেভাবে ছেলেটিও একটা ঘরের পর্দা ঠেলে ছুটে বেরিয়ে মেয়েটিকে ধরতে এসেছিল। পড়ে যেতো বলে তার আগেই আমি যদিও ওর হাতটা ধরে ফেলে নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে দিয়েছিলাম।

না, বলছি এইজন্য যে, আমি সেখানে দাঁড়ানো সত্ত্বেও ছেলেটি বৌটির গলায় হাত রেখে যেসব কথা বলছিল।

কিন্তু তা শুনে তা বুঝে করব কি। আমি করবার কে। চোখ মুছে ফের মেয়েটি গাড়িতে উঠে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরিয়ে নিতে বলেছিল। ডবল ট্রিপ। দু'টো বেশি পয়সা রোজগার হয়েছিল। ঐ পর্যন্ত।

আর দেখিনি ওকে।

অবশ্য এরকম ঘটনা আমি আঙুলের কড়ে গুণে আপনাদের শোনাতে চাই না। শোনাই না। আমরা সব দেখে বুঝে চুপ থেকে সিগারেট ধরিয়ে ফটক ছেড়ে চলে আসি। কথাটা উঠছে এইজন্যে যে, হাত ধরেছিলাম।

কিন্তু আমার হাত ধরায় কী এসে যায়। আমার দিকে আর কবার ও তাকিয়েছিল? যে হাত ধরেছিল ফেরার পথে তার মুখ ভেবেই সারা রাস্তা চোখে রুমাল চাপা দিয়ে বৌটি গাড়ির কোণায় মাথা রেখে নিঝুম পড়েছিল। কাজেই আমাদের ট্যাক্সিওয়ালাদের হৃদয় মন হাসি-কান্নার মধ্যে উঁকি না দিয়ে থাকাই লাভ।

কী, সেদিন, আমি যতক্ষণ না রিচি রোডের উমা চ্যাটার্জিকে তুলে চৌরঙ্গির হোটেলের একটা কামরায় পৌঁছে দিতে পারছিলাম ততক্ষণ, সারাটা বিকেল, উনিশ বছরের (কি কুড়ি একুশ বছর বয়স হবে বৌটির) একটি মেয়ের শরীরের তাপ, খাঁ খাঁ যৌবন, মাংসের মসৃণতার স্বাদ হাত দিয়ে ছুঁয়ে

দেখেছি চিন্তায় বুঁদ হয়ে শিস দিয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়েছিলাম। মন খারাপ করব কেন।

হ্যাঁ, ট্যাক্সিওয়ালা তার ওপর রমার সেই ঘটনায় হৃদয় নামক জিনিসটাকে গাড়ির চাকার তলায় থেঁতলে থেঁতলে এই শহরের পিচের রাস্তায় আমি যে সাত বছরে একেবারে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলাম তা সহজেই আপনারা অনুমান করতে পারছেন।

আর এক মেয়ে উমা।

কী চেহারা মশাই। আগুন।

এখনো কলেজে পড়ছে। এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চুরি করে রোজ হোটেলে সেই ভদ্রলোকের কাছে কেন যায় আমি কি জানি না, জানি, জেনে চুপ থাকি।

চুপ থাকার কারণ কাল আবার ট্যাক্সিটা যখন উমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ধীরে ধীরে চালিয়ে যাব ও হাত তুলে ডাকবে।

পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট সময় লাগিয়ে একটা নীল কি গোলাপী সিল্কে শরীর মুড়ে চোখে কাজলের পুরু প্রলেপ বুলিয়ে ও আমার ট্যাক্সিতে চাপবে। হুঁ সিনেমায় যাচ্ছে। আজ তিন মাস। সেই হোটেল। সেই সন্ধ্যার অন্ধকার কামরা। অথচ আর সব ঘরে আলো।

ফুলের মত মেয়ে উমা।

কিন্তু হৃদয়বৃত্তি, ন্যায় অন্যায়ের চর্চায় মাথা ঘামালে আমার চলছিল কি। হোটেলে পৌঁছে দেওয়া মাত্র একটা দশটাকার নোট। মিটার খরচ পাঁচ আমার বখশিশ পাঁচ।

টাকাটা পকেটে পুরে লম্বা সেলাম জানিয়ে আর একবার উমার লম্বা ঘাড় মৌচাকের মত মস্ত খোঁপা ও সোনার বর্শার মত সুন্দর লম্বা হাত দুটো দেখে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছি। ওই দেখাটুকুনই আমার লাভ।

উপরি পাওনা।

এত কথা বলছি এই জন্যে যে, এখনো যে আমার ওই মেয়েটির পিঠ ছুঁয়ে দেখতে ভয়ানক ইচ্ছা হচ্ছিল সেটা নিতান্তই শাদা ইচ্ছা। হাই-এর সঙ্গে ওঠে নামে। এই ইচ্ছাকে আমি কোনোদিনই কাজে পরিণত করব না; কোনো ট্যাক্সিওয়ালাই করে না। লোকের মার পুলিসের

হ্যাঙ্গামা ম্যমলা মোকদ্দমা যা-হোক একটা কিছুর কথা ভেবে তারা ভীষণ নিক্রিয় হয়ে বসে থেকে সিগারেট টানে। সিগারেট টানে আর ঘড়ি দেখে। কখন সময় হবে। কখন সে এসে গাড়ি আলো ক'রে বসবে আর বলবে, 'চালাও।'

আমিও তার অপেক্ষা করছিলাম। খাওয়ার পর আরো একটা সিগারেট শেষ হয়েছে। পুরো পঁচিশ মিনিট এখানে খেয়ে বসে বিশ্রাম ক'রে কাটানো গেছে হিসাব করলাম।

'ওটা তোমার ট্যাক্সি?'

ঘাড় নাড়লাম।

আর অবাক হলাম বৌটিকে দেখে। হ্যাঁ সুন্দর বলতে সুন্দর। সিঁদুরের রেখাটা অমন সরু করে না দিলে অত সরু চুলের সঙ্গে মানাত না। আর এমন সুন্দর চোখ। লম্বা সরু পালক ঘেরা দু'টো দীঘি। জল টলটল করছে, জীবন। ব্লাউজের হাতায় আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিতে বেরিয়ে আসা কচি সবুজ সোনালী আঙুর গুচ্ছ। শাড়ির পাড় আছে। সূক্ষ্ম জড়ির কাজ। দূর থেকে বোঝা যায় না।

'বাঙালী ট্যাক্সিওয়ালা আমার ভাল লাগে।' মেয়েটি বলল।

আমি চুপ করে হাসি।

লম্বা স্বর্ণচাঁপার মত দু'টো আঙুল গলিয়ে বৌ বিলের টাকাটা কাউ-ণ্টারের ওধারে পাঠায় আর এক হাত দিয়ে মনি-ব্যাগটা বুকের মধ্যে ব্লাউজের ভিতর রাখে।

আমি ইতিমধ্যে সিগারেট ধরিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিই। কেননা সেখানে দাঁড়িয়ে হা ক'রে চেয়ে থাকা অসভ্যতা।

'ভারি সুন্দর গাড়ি তো!'

গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বলল। মনে মনে বললাম, তোমার মত সুন্দরী মেয়েরাই তো আমার গাড়ির সওয়ার। ওরা রোজ বেরোয়, বেড়ায়। তুমি, তোমায় তো আর কোনোদিন দেখিনি!

'এই ট্যাক্সিওয়ালা!'

ঘাড়টা ফেরাই।

'কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞেস করছো না তো?

আহা, কী দাঁত।

আমার তো মনে হয় ঐ দাঁত দিয়ে যদি সে কামড়াতে চায় তো রাস্তার সব পুরুষ দাঁড়িয়ে পড়বে, হাত বাড়িয়ে দেবে, গলা কি আঙুল। কেটে আলগা করে দিক।

আমি দেখছিলাম ওর গাল।

হ্যারিসন রোডের দিক থেকে রোদের লম্বা রেখা ওর গালে গলায় পড়ছিল। ওর পাতলা চামড়ার তলার রঙের লাল আভা দেখছিলাম। গলা বাড়িয়ে দিয়ে সে সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখছিল তখন। সামনে রেড সিগন্যাল। এগোবার উপায় নেই। তাই দু'জনের কথা বলার সুযোগ হ'ল।

'লোয়ার সার্কুলার রোড বললেন না? ওই তো দক্ষিণ দিক।'

'হ্যাঁ, তারপর বাঁয়ে। মিডল রোড।'

'ও দশ মিনিটে নিয়ে যাব।'

'আবার সেখান থেকে আমাকে এই গাড়িতে ফিরতে হবে। চারটের মধ্যে মাণিকতলায় ফেরা চাই। হরিতকী বাগান লেন।'

'তা হবে খুব হবে, বিশ মিনিট লাগবে বড় জোড় নর্থে ফিরতে।

ঘাড়টা সম্পূর্ণ ঘুরিযে আবার সুন্দর চোখজোড়া দেখলাম। দেখলাম আর দরকার হলে কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালারা যে কত ভদ্র মার্জিত গলায় জেনানাদের সঙ্গে কথা বলে প্রমাণ করতে আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'শেয়ালদার রিফুইজি হোটেলটায় খেতে ব'সে আপনি হঠাৎ যেভাবে গলা বাড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকালেন তখনই বুঝে গেলাম আপনি গাড়ি খুঁজছেন। ট্যাক্সি চাই।'

একটু হাসলাম।

ওর একটু নিশ্বাস এসে আমার গলায় ও ঘাড়ে লাগল। ভাল লাগল। অবশ্য এগুলো আমাদের উপরি-পাওনা। গাড়ি একটু সামনের দিকে ঝুঁকলেই মেয়েদের গায়ের গন্ধ এসে আমাদের গায়ে পিঠে লাগে। রাস্তা পরিষ্কার দেখে চট্ করে আমি তখন স্টার্ট নিয়েছি।

'চারটের মধ্যে ফিরতে পারলেই হ'ল। ওখানে আমার বেশি দেরি হবে না। যাচ্ছি তো একটা কথা বলতে।'

'কার সঙ্গে?'

'মার সঙ্গে।'

'ওখানে বুঝি আপনার মা থাকেন ? মিডল রোড কত নম্বর ?'

পাঁচএর পি কি সি বুঝতে পারলাম না কিন্তু তা না পারলেও কার কাছে যাচ্ছে একবার একটা প্রশ্নের ঢিল মেরেই যে জেনে নিতে পারলাম জেনে সুখী হলাম। আমরা ট্যাক্সিওয়ালারা কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে আগেই জেনে গেলে একটু বেশি খুশি মেজাজে গাড়ি চালাই তো।

'আর ওখানে বুঝি আপনার শ্বশুরবাড়ি মানে স্বামীর ঘর, হরিতকী-বাগান লেন ?'

কথা না কয়ে থুঁতনি নেড়ে বৌ হাসল। রামধনুব মত বাঁকা ভুরু টান করে ফিসফিসে গলায বলল, 'ওটা আমার স্বামীব ঠিকানা। তোমরা ট্যাক্সিওয়লারা চট্ করে বুঝে ফেল।'

'তা কেন পাবব না, আমরা কি এ-লাইনে নতুন নাকি। আপনাদের কে কোথায় থাকেন আসা-যাওয়া দিযে আমাদেব বুঝতে হয়। অনেক সময় ঠিকানা ভুলে যাবার পরও আন্দাজের ওপর আমবা গাডি চালাই।'

'হ্যাঁ, শেয়ালদা থেকেই ট্যাক্সি ধরব ঠিক কবেছিলাম। ভীষণ খিদে পেল ট্রেন থেকে নেমে। দুটো খেযে নিলাম। সারাদিন খাওয়া হয়নি। ইস্ কী রান্না!'

'বাইরে কোথাও বেডাতে যাওয়া হয়েছিল বুঝি ?'

'হুঁ, কাঁচডাপাড়া। আমাব ছোট ভাই আছে ওখানে। টি, বি।'

'আজকাল টি বি'র জ্বালায় প্রাণ ঝালা-পালা। চারদিকে কেবল ওই।'

উত্তরে কি বলল ও বোঝা গেল না। কেননা একটু ফাঁকা পেয়ে গাড়ি জোরে চালিয়েছিলাম। তা ছাড়া এলোমেলো হাওযা ছিল।

আর একটু পর। একটা বাঁক ঘুবতে সামনে প্রকাণ্ড ভেড়ার পাল পড়ে গেল। রং করা ওদের গায়ের পশম। হাতে সময় আছে, তাড়া-তাড়ি ছুটব বলে পথ পেতে খামকা কতগুলো হর্ন দিয়ে স্লটার হাউসের যাত্রীদের ব্যতিব্যস্ত করতে বাধল। বরং যতটা পারা যায় আস্তে, বেশ আস্তে গাড়ি চালিযে ঘাড ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাই।

'তোমার কি সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি ট্যাক্সিওয়ালা। তা হলে গাড়ি থামিয়ে এইবেলা সিগারেট ধরিয়ে নিতে পার।' বৌ তার হাতের ঘড়ি দেখল। 'হাতে সময় আছে।'

দাঁড়িয়ে পড়ি। স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। রাস্তায় চলতে এ ধরনের সহানুভূতিগুলি আমরা খুব পছন্দ করি।

সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আজ রাতটা তা হলে মার কাছেই থাকবেন। ও-বাড়ি ?'

'ও মা, কি বলছি, তোমায় ট্যাক্সিওয়ালা ? এই গাড়িতেই যে আমাকে মাণিকতলা ফিরে যেতে হবে। চারটের সময় আমাকে হরিতকী-বাগান লেনে নামিয়ে দিতেই হবে।'

কথাটা মনে ছিল না তাই লজ্জায় হাসলাম। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'আমার স্বামী খুব কড়া লোক। কোথাও একলা বেরোতে দেয় না। আজ ও একটু অফিসের কাজে বাইরে গেছে। বিকেলে ফেরার কথা। এই ফাঁকে ওদের দেখে নিচ্ছি। একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'আবাবা, আপনি তা হলে ভীষণ লোকের পাল্লায় পড়েছেন। সারাক্ষণ বাড়িতে ?'

'সারাক্ষণ।'

চোখ জোড়া ভীষণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল মেয়েটির।

'আমি যে কী সংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়েছি তা যদি তোমরা বাইরের লোক একটু জানতে ট্যাক্সিওয়ালা, আমি কী ভীষণ লোকের ঘর করছি।'

নতুন করে স্টার্ট দেওয়াতে আমার গাড়ির ইঞ্জিন ধুকধুক করছিল। আমিও সেরকম একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম ভিতরে।

এই গাড়িতে চড়ে আমার এই ট্যাক্সির হাওয়া লাগিয়ে লাগিয়ে শহরের কত অসংখ্য মেয়ে আমোদ-ফুর্তি লুটছে তা যদি তুমি জানতে বৌ, রোজ—অবশ্য তারা তোমার চেয়ে অনেক বেশি চালাক ঢের বুদ্ধিমতী।

কথাটা বললাম না।

কেননা আমাদের ট্যাক্সিওয়ালাদের এসব ব্যাপারে নাক ঢোকাতে নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে সেই নরম বুক কতটা ওঠে নামে আড়চোখে সেটুকু দেখে নিয়ে আমি নিজের কাজে মন দিই, জোরে দুই হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরি। ভেড়ার দল সরে গেছে। ফাঁকা রাস্তা।

'আপনি যখন জানা হয়ে রইলেন তখন মাঝে মধ্যে দুপুরে আধ ঘণ্টা আমার ট্যাক্সিতে করে বেড়াতে বেরোতে পারেন। আপনার স্বামী

অফিসে বসে মোটেই টের পাবেন না। কোন্ ফাঁকে কখন আপনাকে তুলে ঘুরিয়ে আবার কলে জল আসবার আগে হরিতকীবাগান লেনে রেখে এসেছি। মিডল রোড যান ইচ্ছা পার্ক সার্কাস যান, সময় মত নিয়ে যাব, আবার ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বাড়ি ফিরিয়ে আনব।'

'আচ্ছা দেখা যাবে, সে দেখা যাবে।' বৌ বলল আর আমি আড়চোখে ওর লম্বা শ্বাসের সঙ্গে বুকটা কতটা কাঁপে তা চুরি করে লক্ষ্য করি।

কেননা কাল হয়তো ওকে আর দেখতেই পাব না, কোনোদিনই না।

'এবাড়ি ?'

'না, আর একটু চলো।'

আমি বললাম, 'যদি মন খুব খারাপ লাগে তো আজ রাতটা মার বাড়ি থেকে যান। একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেই হল। মার অসুখ।'

'তোমরা যত সহজ মনে করো ট্যাক্সিওয়ালা তত সহজ না। ঘরের বৌয়ের বাইরে মানে স্বামীর ঘব ছাড়া আর কোথাও বাত কাটাতে হলে অনেক তথ্য প্রমাণ হাতে নিয়ে নামতে হয। যে-লোক সাত জন্মে শ্বশুব-বাডি যায না, সে ছুটে তক্ষুণি এসে দেখে যাবে কতটা অসুখ, কী রকম অসুখ শাশুড়ীর।'

'বুঝতে পেরেছি,' আমি অল্প হেসে মাথা নেড়ে বললাম, 'আপনার শরীরটা আপনাব স্বামীর কাছে একটা মদ বিশেষ, দামী নেশার মত। কিছুতেই আপনি না থাকলে ভাল লাগে না।'

অল্প হেসে বললাম আর দু'বার ঘন ঘন, ও দেখে ঠিক সে ভাবেই ওর গলার নরম পেশীর ওঠানামা দেখলাম।

সত্যি দামী শরীর বলে আমার এতটা লোভ হচ্ছিল মেয়েটির ওপর, কিন্তু কি করি উপায় কি, কতটা আব করতে পারে একটি যুবতী মেয়েকে একলা গাড়িতে নিয়ে যখন শহরের ট্যাক্সিওযালারা চলে। একটা বাড়ির নম্বর দেখে সরে আর একটা মোচড় দিয়ে এগোই। 'এ বাড়ি ?'

'বেঁধে।'

হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিতে ও নামল। 'তুমি দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি কথা সেরে আসছি।'

আমি গলা বাড়িয়ে আবার ওর পায়ের মাংসের গোছা দেখলাম। কেন জানি আমার তখন গরম ফাউলকারীর কথা মনে পড়ে গেল।

মুখটা ফেরানো ছিল। চিবুকের ধারটা দেখে আপেলের টুকরোর কথা মনে পড়ল। আর টুসটুসে আঙুর!

আহা পৃথিবীর সেরা আঙুর ভেবে সারারাত চুষে ছিবড়ে করে ফেললেও রস যাবে না, ভাবলাম।

কিন্তু ভেবে কি আর আমি গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিলাম। শতকরা নিরানব্বই জন ট্যাক্সিওয়ালার মত ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে গাড়িটাকে ব্যাক করে একটু ঘুরিযে একটা গাছের ছায়ায় নিয়ে রাখলাম উল্টা দিকে মুখ করে।

হ্যাঁ ওর শরীরের ওপর বেশি লোভ করেছিলাম বলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে এই দাঁড়াল। দেখুন কী সব ঘটনা ঘটে আমাদের জীবনে! আমি তো ভাবছিলাম যার সঙ্গেই দেখা ক'রে ও বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। চোখে জল। নীল রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে!

কিন্তু তা না। শাদা কাঠের গেট-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক চিৎকার করছিল। হ্যাট্ পরা। সাহেব মানুষ। যেন এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরছে কি এখন বাইরে যাবে।

তা অত সব চিন্তা করার সময় ছিল না।

আমি কথা শুনছিলাম দু'জনের।

ট্যাক্সিওয়ালাদের দাঁড করিয়ে আপনারা যেমন কথাবার্তা বলেন।

'বাড়িতে আর কোনদিন তোমাকে দেখলে আমি ঠিক গুলী করব, চিত্রা।'

'আমার গ্রাসাচ্ছাদনের যতদিন না সুব্যবস্থা হয় তদ্দিন আমাকে আসতে হবে।'

'না চরিত্রহীন স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দিতে আমি বাধ্য নই।'

'বেশ তা হ'লে আমি কোর্টে যাব।'

'হ্যা, তাই যাও আমি তাই চাই। একটা প্রষ্টিটিউট এসে মোকদ্দমা করে মহীতোষ রায়ের কাছ থেকে খোরপোষ আদায় করবে। বেশতো তাই একবার চেষ্টা কর।'

বলে মহীতোষ রায়, সেই হ্যাটকোট পরা ভদ্রলোক সযত্নে কাঠের গেট্টায় একটা তালা পরিয়ে দিয়ে গট্ গট্ ক'রে ভিতরে চলে গেলেন।

চিত্রা ঘুরে এসে আমার গাড়ির কাছে দাঁড়াল। দরজা খুলে দিতে ভিতরে ঢুকল। 'চালাও।'

এ সময়টা আমরা বিশেষ কথাবার্তা বলি না। কিন্তু তবু স্টার্ট দেওয়ার পর আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি নীল রুমাল দিয়ে চোখটা এখনো টিপে আছে কি না।

'এই ট্যাক্সিওয়ালা!'

খানিকটা অগ্রসর হবার পর, ও আমায় আস্তে ডাকল। ঘাড় ঘুরিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই। রুমাল সরে গেছে। চোখের কোণ শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে।

'তুমি তো দাঁড়িয়েছিলে কাছে, কথাগুলো শুনলে?'

কথা বললাম না। সামনে এবার একপাল মোষ। রাস্তাটা কালো হয়ে গেছে।

'ও আমাকে গুলী করে মারবে।'

যেন কিছুই হয়নি, এসব কথার কোনো দাম নেই, এরকম একটা ভান সময় সময় আমাদের করতে হয়। গাড়িটা একেবারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে অল্প হাসলাম: 'ও কিছু না। আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। দু'দিনেই মিটে যাবে।'

বললাম, বলতে হয় আমাদের এসব।

কিন্তু দেখলাম সেকথায় বৌটির কান নেই। এক দৃষ্টে রাস্তার ধারের একটা বাদাম গাছের গুড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে কি ভাবছে। জায়গাটাও নির্জন।

মোষেরা অনেকটা এগিয়ে গেছে।

'না মিটবে না, এ ঝগড়া মিটবার নয় তা সে-ও জানে আমিও জানি।' তেমনি বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্পষ্ট ধরা গলায় ও যেন নিজের মনে কথাগুলো বলল, তারপর হঠাৎ এক সময় মুখটা ফিরিয়ে আমার চোখের দিকে তাকাল।

'ট্যাক্সিওয়ালা!'

'কি, বলুন।'

'ও আমায় ঘৃণা করে। কিন্তু আমিও যে ওকে ঘৃণা করি তা কি সে বোঝে না?'

আমি হাসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না। মেয়েটির গলার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত শব্দ হতে শুনলাম যে চমকে উঠলাম।

'গুলী করবে, সামান্য ক'টা টাকা চাইতে গেছি ব'লে তোমার সামনে, একজন ট্যাক্সিওয়ালার সামনে আমাকে অপমান করল, উঃ, কিন্তু, কিন্তু,—সে কি মনে করে—'

আমি হতভম্ব হয়ে ওর কাণ্ড দেখলাম।

'কোথায় গুলী করবে, এখানে এই বুকে, এই বুকের মাংস ঝাঁজরা ক'রে দেবে মহীতোষ!' উপেক্ষার হাসি হেসে দ্রুত ব্যস্ত আঙুলে ব্লাউজের সব সব ক'টা হুক ও খুলে ফেলল। 'হ্যা, তোমায় দেখাচ্ছি, তোমার সামনে অপমান করল কি না, তুমি দেখে রাখো, আমার এই বুক লক্ষ টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা রাখে কি না,—সামান্য ক'টা টাকা, সামান্য ক'টা—উঃ এত অপমান!'

এ-ধরনের অভিজ্ঞতা জীবনে আমার হয়নি। কিন্তু তা না হলেও বিমূঢ় বা বিব্রত হওয়ার পরিবর্তে শরীরটাকে শক্ত কঠিন ক'রে আমি ইঞ্জিনের দিকে ঘুরে বসার উপক্রম করতে ও আমার হাতে চেপে ধরল। এবার বিব্রত হয়ে পড়লাম। ব্লাউজের মুখটা হা ক'রে আছে। নিশ্বাসের সঙ্গে দু'টো পেশী শক্ত হয়ে উঠে আবার জেলীর মত নরম হয়ে যাচ্ছে।

এতৎসত্ত্বেও হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু ততক্ষণে ও আমার হাতের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। গরম জল টের পেলাম। কান্নার ঠমকে সেই সুন্দর র‍্যাদা করা পিঠ অনেকবার উঠল নামল।

কিন্তু তা দেখবার সময় বা ইচ্ছা কোনটাই আমার ছিল না। তিক্ত গলায় বললাম 'তা অত ঘৃণা যখন ওখানে গিয়েই বা কাজ ছিল কি—' বলছিলাম, কিন্তু এমন অস্পষ্টভাবে কথাটা মুখ থেকে বেরোল যে ও শুনল বলে মনে হ'ল না।

হেচ্‌কা টান মেরে হাতটা এবার ছাড়িয়ে নিয়ে মোটা গলায় বললাম, 'ভাল কথা, এখন আপনি কোথায় যাচ্ছেন কিছু বলছেন না তো, সেই হরিতকী বাগান লেনের ঠিকানায় কি ট্যাক্সি—'

আমার কথা শেষ হবার আগে ও চোখে নীল রুমাল গুজে মাথা নাড়ল। তারপর রুমাল সরিয়ে নিয়ে অল্প হেসে বলল, 'বেশ্যার আবার ঠিকানা কি, ট্যাক্সিওয়ালা।'

আপনারা ভাবছেন সেই মদির হাসি দেখে আমার বুকের ভিতরটা তির তির্ করে উঠবে, কিন্তু তা হয় না, আমরা হতে দিই না। তৎক্ষণাৎ ব্রেক্ কষে

আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলাম। এবং মুখের ওপর সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, 'সঙ্গে পয়সাকড়ি কিছু আছে কি, ট্যাক্সিভাড়া দিতে পারবে ?'

'না।'

'তবে এক্ষুণি নেমে পড়ো।' কর্কশ গলায় চিৎকার ক'রে উঠে আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে দিই। আর আমার মুখের দিকে তাকায়নি, ঘাড় নিচু ক'রে ও গাড়ি থেকে নেমে গেল। একবারও সেদিকে না তাকিয়ে আমি জোরে গাড়ি চালিয়ে সার্কুলার রোডে উঠে এলাম। তেল না, জল, তাই ট্রাউজারে হাতটা ঘষে তা মুছে ফেলতে অসুবিধা হ'ল না।

———

রবিবারের সকাল।

দক্ষিণা দাড়ি কামানো সেরে ফেলল।

সারদার স্নান হয়ে গেছে। চুল আঁচড়ানো শেষ করে মুখে গলায় পাউডার ছড়াচ্ছে।

'কোনদিকে যাবি ?'

'একটা বাড়ির সন্ধানে বেরুচ্ছি। তুই ?' দক্ষিণা তোয়ালে রগড়ে মুখের সাবানের ফেনা মজায়। 'বেশ সাজগোজ ক'রে বেরোনো হচ্ছে দেখছি।'

সারদা তখনই উত্তর দেয় না।

কাঁঠাল রঙের এণ্ডির পাঞ্জাবী সুটকেশ থেকে টেনে বার করে।

তোয়ালেটা গলায় জড়াতে জড়াতে দক্ষিণা বলে, 'কিন্তু শালার ঘর কি পাব ? ঘর আমাদের জন্যে নয়।'

সারদা প্রশ্ন করে, 'কার জন্যে ?'

'যাদের আছে, এক থোক্ টাকা ঢালতে পারে, সেলামী—তা অত টাকা কই আমার যে হট্ করে ঘর জোটাবো।'

সারদা বলল, 'বাঁচা গেল বাবা, এই বাজারে বিয়ে টিয়ে করলে বৌ রাখতুম কোথায় !'

দক্ষিণা চুপ থেকে শুনলো।

একটা রবারের বল্ পাশের জানালা দিয়ে উড়ে এসে ঘরে ঢোকে। মেঝের উপর হু'টো লাফ দিয়ে বল্‌টা গড়িয়ে সারদার খাটের পায়ার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ায়।

দক্ষিণা সেদিকে চেয়ে।

সারদা বলল, 'আমি একটু বালিগঞ্জে যাচ্ছি।'

দক্ষিণা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। 'তোর সাজগোজ করা দেখেই বুঝতে পেরেছি।'

'কিন্তু মেয়ে কই, প্রপারলি স্পিকিং, আমি ঠিক বিয়ে করতে পারি এমন একটা মেয়েই খুঁজে পাচ্ছি না।'

দক্ষিণা চুপ।

সারদা জামায় সোনার বোতাম পরায়। 'তা তুই টালীর ঘর-ফর এক-আধটা পাস কিনা খুঁজে ছাখ্ না, সস্তা ভাড়া।'

'সব খোঁজ করেছি, প্র্যাক্টিক্যালি স্পিকিং উল্টোডিংগী, বাগমারী, সোদপুর, কাশীপুর অবধি ধাওয়া করছি রোজ অফিসের পর ঘর ঘর ক'রে—ঘর কই?'

সারদা আঙুল টিপে কাপড় কুচি দেয়।

'সব থাকতে শালা আমি এখন মেসে খেয়ে ডিসপেপসিয়ায় ভুগছি, কপাল।' দক্ষিণা করুণ গলায় শেষ করল।

সারদা মৃদু হেসে শিষ দেয়।

'ব্রাদারের মনটায় সকাল থেকেই বেশ ফুর্তি দেখছি। ব্যাপার কি? দোয়েল শ্যামা এলো কি শেষটায় গঞ্জে গঞ্জে ঘুরে?' দক্ষিণা জিজ্ঞেস না ক'রে পারল না।

'অনেক আসে ভায়া, অনেক যায়, ট্রুলি স্পিকিং নিয়ে ঘর করার মতন একটা চেহারাও না, অনেক তো ঘুরলাম।'

দক্ষিণা চুপ। চুপ ক'রে হাতের তেলোয় তেল ঢালে খানিকটা, তারপর মাথায় ঘসে।

'অত বাছাবাছি ক'রেও লাভ নেই। বরং মেয়ে বাছাবাছি না করে সেই টাইমটা একটা বাড়ি খুঁজে বার করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ছাখ্ না একটা দু'কামরা। শেয়ার ক'রে থাকা যাবে। মেয়ে পাবি তুই,—ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং আমার হাতে ভাল মেয়ে আছে। তোর সঙ্গে চমৎকার ম্যাচ করবে। আয় দু'জনে মিলে আগে একটা বাড়ি খুঁজে বার করি।'

যেন সারদা দক্ষিণার প্রস্তাব হঠাৎ কানে তুলল না। পরে আস্তে আস্তে বলল, 'ঘর আমি হট্ ক'রে পেয়ে যাব,—আমি চাই, খুঁজছি যা, স্যুটেব্‌ল গার্ল। যাকে নিয়ে রিয়েলি ঘর করব। বললাম তোমায়।'

সারদার টাকা আছে তাই ঘরের ভাবনা ভাবে না। ভেবে দক্ষিণা চুপ থেকে ঢোক গেলে। ঈর্ষা ও মনস্তাপ মিশ্রিত চাউনি।

'তা আমি অবশ্য ওয়েট করব।' সারদা হঠাৎ কি ভেবে যে মত পরিবর্তন করল। 'নয় ছুটির সকালটা তোকে একটু সাহায্য করি। চট্ ক'রে তুই স্নান সেরে আয়। আমি বেরোবো তোর সঙ্গে ঘর খুঁজতে।'

'হুঁ!' খুশি হয় দক্ষিণা। 'নয় বিকেলে যাবি বালিগঞ্জে বেড়াতে।
সত্যি আমি কী ভয়ানক বিপদে পড়েছি—সারদার বাথ্ গেটের শিশিটা আরো
খানিকটা উপুড় ক'রে দক্ষিণা তেলোয় তেল ঢেলে নেয়। 'বিয়ে করিসনি,
মাথায় চাপ নেই তোর বুঝবনি। দে খুঁজে একটা ঘর পারিস তো আজই।'
রুমালে এসেন্স ঢালল সারদা।

'তাই বলে কি মেসের ভাত খেতে আমারই ভাল লাগছে, ব্রাদার। আমি তো হয়রাণ হয়ে গেলাম। যদি সন্ধানে থাকে আজই মেয়ে দাও আমায়, আর পারি না।'

একটু চুপ থেকে সারদা প্রশ্ন করল, 'বৌদি কোথায়?'

'শ্যামপুকুর, মামার কাছে।' রুদ্ধশ্বাসে বাকী তেলটুকু মাথায় ঘসা শেষ ক'রে দক্ষিণা বলল, 'ঠিক বেরুচ্ছিস তো আজ আমার সঙ্গে?'

'নিশ্চয়।' সারদা আয়নায় মুখ দেখে শিষ দেয়। 'তুমি সেরে এসো। আটটা বাজে।'

দক্ষিণা স্নানের ঘরে চলে যায়।

পুরোনো পচা ভাঙ্গা মেসবাড়ি সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের ওপর।

ভালো একটা হোটেল থেকে কি কারণে স্থানচ্যুত হয়ে সারদা এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছে। আর গৃহচ্যুত ইজেক্টমেণ্টের নোটিশ-তাড়িত দক্ষিণা এসে মেসে সীট ভাড়া করল তো করল সারদারই ঘরে।

দুই বন্ধুর পুনর্মিলন হ'ল।

এক স্কুলে পড়েছিল। এক জায়গায় বড় হয়েছিল। বড় হয়ে দু'জনে ছাড়াছাড়ি।

বড় চাকুরে সারদা রায় এখনো অবিবাহিত দিব্যি কার্তিকটি সেজে হোটেল-জীবন যাপন করছে। পত্নী ও একটি পুত্র-সন্তানের ভারে প্রপীড়িত ছোট চাকুরে দক্ষিণা দত্ত বিমর্ষ চিন্তাব্যাকুল।

কিন্তু দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বটা আবার গাঢ় হ'তে বিলম্ব হ'ল না।

এখন তখন সারদার মাখনের কৌটা থেকে দক্ষিণা মাখন তুলে খাচ্ছে, বিস্কুটের টিন থেকে বিস্কুট খাচ্ছে, পরছে ওর জামা-কাপড়, জুতো ঘড়ি মাখছে সুগন্ধ তেল সাবান। আর হা হুতাশ করছে: ঘর ঘর।

মেয়ে মেয়ে করে বিলাপ করছে সারদা।

দক্ষিণা কাছে এসে পড়াতে, গরীব যদিও এবং যদিও সারদার নিত্য ব্যবহার্য জিনিষগুলি সে মুহুর্মুহু ব্যবহার করছে, সারদার ভাল লাগল।

অভিজ্ঞ লোক। কি রকম মেয়ে বিয়ে করলে জীবনে প্রচুর সম্ভোগ হবে দক্ষিণার সঙ্গে সারদা আলাপ করে নিশ্চিন্ত হয়।

সুতরাং দক্ষিণার ঘর খোঁজায় সাহায্য করতে সারদার গররাজী হবার কথা নয়, তার আর্থিক সাহায্য করাই তো উচিত।

কলতলায় ট্যাপের নীচে মাথা রেখে দক্ষিণা ভাবে।

স্নান সেরে দক্ষিণা ঘরে ঢোকে যখন দেখে লাল টুকটুকে মুখ ছেলেটার গাল টিপছে সারদা। বলটা নিতে এসে প্রিয়দর্শন কিশোর সারদার খপ্পরে পড়ে গেছে। দক্ষিণা ঠোঁট টিপে হাসল।

গাল টেপা শেষ কবে সারদা ওর পেন্টুলনের পকেটে মুট মুট চকলেট লজেন্স ঢুকিয়ে দেয। চকলেট লজেন্সের কিছু ষ্টক্ রাখে সারদা অন্য আর দশরকম চিজের মতন। পয়সার তো অভাব নেই।

কিন্তু দক্ষিণা হাসে অন্য কারণে। ছেলেটা বেরিয়ে যেতে এক-চোখ ছোট করে দক্ষিণা বন্ধুর দিকে তাকাল।

'এই বয়সে আইবুড়ো হয়ে আছিস কেমনে।' চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সারদাকে খোঁচা দেয় সে। 'কি করে পারিস তোরা ভাবি।'

যে হাত দু'টো দিয়ে ছেলেটার গাল টিপছিল সেই হাত দু'টো আর একবার দেখা শেষ ক'রে সারদা নিশ্বাস ফেলল।

'থাকতে কি পারি ব্রাদার, কিন্তু—কিন্তু ঐযে বললাম।'

চুল পাট করা শেষ হ'ল দক্ষিণার।

'ঠিক আছে আমি এসে গেছি যখন চিন্তা নেই।'

'বড ভোগায়, বড় ঘোরায়।' সারদা নিশ্বাস ফেলার মতন ফিস্‌ফিসিয়ে বলল,' 'ঘুরছি তো আর কম না,—আর তাও পোষাতো দেখতুম যদি রিয়েলি কোনটিকে বিয়ে করব।'

'সব ফিঙে বুল্‌বুল্ হয়ে গেছে।' দক্ষিণা সারদার পমেটমের কৌটা খুলল। "রাম! আজকালকার মেয়েগুলোর কোন বিশেষণ নেই।'

সারদা চুপ।

'আমি দেব। ধার ভার দুইই আছে।' দক্ষিণার পাঞ্জাবী পরা হয়ে গেল। 'বিয়ে করা মেয়ের জাতই আলাদা, বুঝলিনে?'

সারদা ঘাড় নাড়ল।

'তুমি চট্ করে সেরে নাও।'

'এই সারছি।' দক্ষিণা সারদার স্যাময়ের জুতোয় পা ঢোকালো।

'বাইরে টিফিন করব।' সারদা প্রস্তাব করে।

'হুঁ।' দক্ষিণা মাথা নাড়ে। 'দরজায় তালা দে।'

মেসবাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দুই বন্ধু মোড়ের রেষ্টুরেন্টে ঢুকলো। চা: রুটি ও ডিমের অর্ডার দিলে সারদা।

দক্ষিণা বলল, 'তা ছাড়া ঘরে থাকার সুবিধা কত। এই যে এতগুলো খরচ করছিস, ঘরে খেলে অর্ধেকের কম খরচে চলতো।'

'আমি কি বুঝি না, ব্রাদার, আমি কি জানি না?' মোটা গলায় সারদা বলল, 'বললাম তো দিচ্ছি জুটিয়ে দু'কামরার বাড়ি—একটায় তুমি, একটায় থাকব আমি, আমায় তুমি এখন—' দক্ষিণা রুটির গায়ে মামলেট জড়িয়ে কামড় বসালো।

আশ্বিনের ফুর্‌ফুরে রোদ ঝুর্‌ঝুরে হাওয়া। জানালার বাইরে তাকিয়ে সারদা কতক্ষণ হা ক'রে রইল।

'নে সেরে নে। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে,' বলে দক্ষিণা নিজের কাপে মুখ দিলে।

চায়ের বাটি থেকে মুখ তুলতে দুই বন্ধু অবাক।

তরুণী।

হাইহীল জুতো ভ্যানিটি ব্যাগ। গালে পাউডার, সিঁথিতে সিঁদুর এবং সামান্য খোপায় সংক্ষিপ্ত একটা ঘোমটা।

বসবি তো বস দু'জনের নাকের সামনের চেয়ারটা জুড়ে বসল।

সারদা ও দক্ষিণা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল একবার।

সেই চা ডিম এবং রুটিই এল।

একই রকম খাদ্য দেখে সারদা ও দক্ষিণা বুকের ভিতরে যেন হাল্কা বোধ করল।

'এরা মামলেট মন্দ করে না।' দক্ষিণা ঈষৎ হাসল।

'হুঁ! এমন লিকার করতে আর কোন দোকানী জানে না।' সারদা বলল।

'আপনারা বুঝি ধারে কাছে থাকেন কোথাও—এই রেষ্টুরেন্টের প্রতিবেশী?' মহিলা সুন্দর ভাবে হাসল।

'আমরা এ পাড়ার বাসিন্দা।' তরুণীর প্রশ্নে সারদা অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হ'ল। 'মোড় পার হলেই মেসবাড়ি, এখান থেকে প্রায় দেখা যায়।'

'মেসের জীব দু'জন, চা-টা টোষ্ট-টা খেতে রেষ্টুরেন্টের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে।' দক্ষিণা হাসির সঙ্গে বিষাদের খাদ মেশালো। 'এদের সুখ্যাতি না ক'রে করব কি।' আলাপ-সালাপে উভয় পক্ষের আহার পান শেষ হ'ল এক সময়। ভ্যানিটি ব্যাগের গর্ভ থেকে খয়েরী চেক্ রুমাল বেরোয়। সারদা বার করে সিল্ক। দক্ষিণার মলিন লংক্লথ।

দোকানের বিল্ মিটিয়ে তিনজন নামলো রাস্তায়।

'আপনি?' দক্ষিণা মুখ তুলল।

'আমি কালিঘাটের বাস্ ধরব।' তরুণী বিদায়ী হাসি হাসছিল।

সারদা ব্যস্ত হ'ল।

'আমরাও। কালিঘাটে বাড়ি খুঁজতে যাচ্ছি দু'জন। আসুন একবাসে ওঠা যাক্।'

তরুণীর পদক্ষেপে ছেদ পড়ল। দাঁড়াল পুরুষদ্বয়েব মুখোমুখি।

'আপনি বুঝি—' সারদা মিন্‌মিনে গলায় কি জিজ্ঞেস করছিল। নারী তখুনি কথার উত্তর দিলে না। আঙুলের বাড়তি একটা নোখ দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে পরে স্নিগ্ধ হাসল।

'আমি কে তাই জিজ্ঞেস করছেন, কি করি?'

দক্ষিণা ও সারদা যুগপৎ মাথা নাড়ল।

'এখানকারই একটা হাসপাতালের নার্স।'

কথা শেষ ক'রে তরুণী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

কালীঘাটের বাস সামনে দিয়ে চলে যায়, কেউ ওঠে না।

'কিন্তু, কিন্তু, আমার মনে হয়, নারী-জাতিব মধ্যে আপনারাই সবচেয়ে বেশি পূজনীয়া, শ্রদ্ধার যোগ্যা। নারীর ধর্মই সেবা। পতির পুত্রের —আপনারা সেবা করছেন সমগ্র সমাজের, সুতরাং—'

ব্যাচেলার সারদা আচমকা সেন্টিমেন্ট্যাল হয়ে গেছে দক্ষিণা লক্ষ্য করল। 'আপনি এদিকে?' ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি সে প্রশ্ন করল।

'হাঁ, হাওড়া স্টেশন থেকে ফিরছি।' দক্ষিণার চোখের দিকে তাকাল রমণী। অগাধ কালো দৃষ্টি। 'কেউ আসছিল বুঝি, কাউকে গাড়িতে তুলে দিলেন?' সারদা ব্যগ্র গলায় বলল।

সারদার প্রশ্নের তখুনি উত্তর দিলেনা ও। দাঁত দিয়ে আর একটা আঙুলের নোখ কাটল। পরে ঈষৎ হেসে সারদার চোখের দিকে তাকায়। 'আসছে তো আজ দু'বছর,—আসে কই।'

বোঝা গেল না, এমন অস্পষ্ট অদ্ভুত চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস দুই বন্ধুর চোখে ঠেক্‌ল।

'কে? আপনার, আপনার—' সারদা দ্বিধাবোধ করছিল।

'কে আসছেন, আপনার স্বামী?' দক্ষিণা সরাসরি প্রশ্ন করল।

'আসুন।' তরুণীর গলায় একটু একটু হাসির ধ্বনি ছিল। 'বাস আসছে আর একটা,' বলল ও পথের দিকে চোখ রেখে। 'উঠে পড়া যাক গা পুড়ে যাচ্ছে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত হোন, এই গরমে ভিড়ে বাসেও আমরা উঠছিনে। দক্ষিণা, কাইণ্ডলী একটা ট্যাক্সি দেখ্‌না। এই ট্যাক্সি—'

—নিকটতম একটা ট্যাক্সির ওপর চোখ পড়তে সারদা হুঙ্কার ছাড়ল।

দক্ষিণা বুঝি পকেট থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বার করছিল, সারদা চোখের ইঙ্গিতে তাকে নিবৃত্ত ক'রে নিজের পকেট থেকে থি-স্টার সিগারেটের টিন তুলল।

মেয়েটি খয়েরি চেক্‌ দিয়ে চিবুক ও গলার ঘাম মুছল!

ট্যাক্সিওলা নেমে দরজা খুলে দিতে তিন-জন গাড়িতে উঠে বসে।

'ছাদ তুলে দেয়া হোক, দেখতে দেখতে রোদটা তেতে গেল।'

দক্ষিণার প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ গৃহীত হয়। সারদা চট্‌পটে হাতে বনেট্‌' তুলে দেয়।

ওকে অনেকটা সম্মান দেখাবার জন্য সামনে ট্যাক্সিওলার সীটে পৃথকভাবে বসতে দিয়ে দু'জন, দুইবন্ধু পিছনের আসনে বসল।

গাড়ি ভবানীপুরের রাস্তায় পড়তে দক্ষিণা ফের সামনের দিকে ঘাড় বাড়ায়।

ক্রাইসিস এখন। 'তা আপনি যদি সিওর হয়ে থাকেন উনি আর আসবেন না, তো আমরা—আমার সাজেশন হ'ল বাকি' দুটো কামরা ভাড়া দিয়ে দিন। কি ভাল কোনো নার্স কোয়ার্টারেও আপনি থাকতে পারেন। বাড়ি আপনার নামেই রইল। নিশ্চয়ই, অনেক খরচ বাঁচবে, তা-ছাড়া, তাছাড়া সেখানে এসোসিয়েশন পাচ্ছেন, কি বলিস সারদা,

আপনার মনের এই অবস্থা 'দক্ষিণা সামনের দিকে একটু বেশি ঝুঁকল। 'ভাড়াটে আপনাকে খুঁজতে হবে না, আমি আছি, আমরা আছি, আমরা ঘর ভাড়া নোব, কি বলিস সারদা ?'

'আঃ থামনা তুই।' সারদা ধমকে উঠল। 'একটা জীবনের ট্র্যাজিডির কাহিনী হচ্ছে, আর আর তোর মনে অমনি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ও'র ঘর। স্বার্থপর। ভাড়া দিতে হয় তোমাকে কেন, তোমার চেয়ে তিনডবল ভাড়া দিয়ে ঘর নিতে রাজী আছে কোলকাতায় এমন পার্টির অভাব আছে কিছু! ও'র আত্মীয়-স্বজন কি জানাশোনা কেউ থাকতে পারে।' কি বলেন হিরণদেবি ?'

'তা অবিশ্যি কেউ নেই, আমি ভয়ঙ্কর একলা।' হিরণ চোখ বুজে মাথাটা পিছনের দিকে ঈষৎ এলিয়ে দিলে।

'তা হলেও, তা হলেও...'বিড়বিড় করতে করতে সারদা আবার সিগারেটের টিন খুলল।

হাজরার মোড় পার হবার মুখে ট্যাক্সিটা একটু সময়ের জন্যে দাঁড়ায়।

দু'হাতে খোঁপা ঠিক করে হিরণ সোজা হয়ে বসে।

দক্ষিণা তখন থেকে চুপ।

বাটালি দিয়ে ছোট কাঠের টুকরো কাটার মতন দাঁত দিয়ে একটা তামাকের গুঁড়া দ্বিখণ্ডিত করল সারদা, তারপর সন্তর্পণে প্রশ্ন করল, 'কোনো ইস্যুটিস্যু কি আপনাদের—'

'একটিও না।' এবার সবটা ঘাড় পিছনের দিকে ঘুরিয়ে তরুণী হাসল। বসন্তের মন্দানিলের মতন স্বচ্ছ লঘু হাসি। 'ঈশ্বর' সেদিক থেকে রক্ষে করেছেন।'

'বাঁচা গেল বাবা, কি দিনকাল।' দক্ষিণা হঠাৎ খুশি গলায় বিড়বিড় করে উঠল।

সারদা কথা বলল না। গম্ভীরভাবে তার ইভিনিং-ইন-প্যারিস মাখানো সিল্কের রুমাল গলায় ঘাড়ে চাপড়াতে লাগল।

গাড়ি আবার চলল।

তারপর থেকে গাড়িটা যেন নার্স হিরণের জিম্মায় চলে গেল।

অর্থাৎ ওর নির্দেশক্রমে ড্রাইভার ট্যাক্সি চালিয়ে নিয়ে গেছে।

ট্রাম ডিপো পার হয়ে গাড়ি বাঁদিকে ঘুরল। সরু পরিচ্ছন্ন রাস্তা। দুধারে কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ। মেয়েদের একটা স্কুল। লাল ছোট্ট সুন্দর গীর্জা। উল্টোদিকে একটা পার্ক। মাঝখানে জল টলটল করছে। আর চারদিকে মেঘ ও রৌদ্রের অফুরন্ত খেলা। আশ্বিনের সকালের ঝকঝকে রোদ এবং তার পিঠেই আবার মেঘ-মলিন ছায়া। মাঠে বাড়িতে—বাড়ির জানালার পর্দায়।

হিরণ একসময় হেসে বলল, 'তা কি হয়, আমায় বাড়ি পৌঁছে দিলেন ট্যাক্সি করে, আর এই রৌদ্রের দুপুরে আপনাদের দরজা থেকে ছেড়ে দোব বাড়ি খুঁজতে। বাড়ি খোঁজা ভয়ঙ্কর কষ্ট। আমার এখানে একটু চা খাবেন, বিশ্রাম করবেন।'

ট্যাক্সি থেকে নেমে একটা পর্দাঘেরা ছোট্ট বাড়ির সামনে ওরা দাঁড়ায়।

পর্দাঘেরা। তার অর্থ বাড়ির সবকটা দরজা জানালায় কুচিপরানো প্রমাণ সাইজ পর্দা রয়েছে। আধখানা ঢেকে আধখানা খুলে নেই একটিও।

'এমনি তো ভারি ভদ্র মনে হয়।' ভিতরে ঢুকবার সময় দক্ষিণা সারদার কানে কানে বলল। কথাটা সারদার তত ভাল লাগল না। সম্মোহিত, বিমুগ্ধ সে। কথা না কয়ে, চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে দেখছিল, সম্পূর্ণ পিছন ফিরে হিরণ ব্যাগ থেকে চাবি তুলে দরজার তালা খুলছে। সুন্দর তরুণীর পিছন। খুট শব্দ করে দরজাটা খুলল। সারদা একটা নিশ্বাস ফেলল। টের পেয়ে একটা খরগোস হিরণের পায়ের কাছে ছুটে এসে নাক দিযে ওব জুতো ঘসতে থাকে। পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ি।

দক্ষিণা, আর কি ফিসফিসিযে বলতে চেষ্টা করে সারদার জামার হাতা ধরে।

'নন্‌সেন্স।' সারদা ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নেয়। 'তোর মন নীচু, তাই ও'র সম্পর্কে এসব আইডিয়া আসছে মাথায়। কি করুণ ব্যর্থ জীবন দেখতে পাসনে?'

বিরক্ত হয়ে রীতিমত গালাগাল ক'রে উঠল সারদা দক্ষিণাকে। দক্ষিণা চুপ।

হিরণ ঘরের দরজা খুলে দিতে একটু আগে আগে সিঁড়ির দিকে চলে গেল। তাই সারদা গুনগুনে গলায় দক্ষিণাকে কথাগুলো শোনায়।

দরজা খুলে দিয়ে হিরণ ঘুরে দাঁড়ায়।

'ওকি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, আসুন।'

হিবণের গলার সঙ্গে বাবান্দার কোণা থেকে একটা কাকতুয়া ককিয়ে উঠল।

হিরণেব মাথার কাপড় পড়ে গেছে। নিটোল হ্রস্ব খোঁপা। গলায় চিকচিক সোনাব হার। বাম মণিবন্ধে জ্বলছে ঘডির ডায়েল।

বাড়ি এত নীবব যে ওব হাল্কা মণিবন্ধেব টিক্‌টিক্‌ শব্দটাও যেন দুই বন্ধুব কানে এসে ঠেকল। এত স্তব্ধ।

দক্ষিণাকে না দিয়ে এবাব সাবদা একলা একটা সিগাবেট ধরায। আব সঙ্গে সঙ্গে প্রচুব ধোঁযা ছাড়ে মুখ থেকে। 'তা তোব যদি চা খেতে ইচ্ছে না হয তুই চলে যা না।' গুম্‌গুমে গলায় সাবদা বলল, 'আমি ঠিকানা দিচ্ছি ঘব পেলেও পেতে পাবিস। চেষ্টা কবে দেখ্‌গে।'

দক্ষিণা নিরুত্তব। দবজার পর্দা ধবে দাঁড়িযে হিবণ। ঠোঁটেব কোণা দাঁত দিয়ে কামডে ধবে তাকিযে আছে। পর্দাটা মোচডাচ্ছে। সাবদা খুব পবিষ্কাব গলায বলল, 'আমি তোব মতন অভদ্র নই। নিমন্ত্রণ উপেক্ষা কবতে পাবব না।'

বলে সে দক্ষিণাব চোখে চোখে তাকাল। পবে তাকায় হিবণেব মুখেব দিকে।

'কি হয়েছে আপনাদেব?' হিবণ এত নিঃশব্দে হাসল যে, শুধু ওব দাঁতগুলো দেখা গেল। খবগোসটা ঘুবছিল ওব পায়েব কাছে।

ঢোক গিলে সাবদা আবাব দক্ষিণাব দিকে মুখ ক'বে দাঁডায়।

'কি করবি তুই ঠিক কবলি?'

সাবদা অতিমাত্রায় রূঢ় হয়ে গেছে। ট্যাক্সি' থেকে নেমে বাডিব চৌকাঠ পাব হবাব সঙ্গে সঙ্গে চলতে গেলে দক্ষিণা হাসতে চেষ্টা কবল।

'—চা খাব না আমি তো বলিনি।'

'যা বলেছ তা এনাফ্‌।'

সাবদা চোখ লাল কবল। মাত্র দু'টো টান দিয়েছিল। সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলে পাশেব একটা ক্রিসেন্থিমামেব টবেব গায়ে।

'মাইরি বলছি আমি, এককাপ চাযেব বেশি খাব না। তোর ভাল না লাগে বরং বাইরে একটু ওয়েট কর্‌।' যেন অনুনয় ক'রে সারদা এবার দক্ষিণাকে বোঝাতে চেষ্টা কবল।

'আমি আসব না, ঘরে ঢুকব না বলি নি তো।' দক্ষিণা তেমনি মৃদুভাবে হাসতে চেষ্টা করে।

'দরকার নেই, তোর এই মুড্ নিয়ে এখানে, এর ঘরে একমিনিটের বেশি নিশ্বাস নিস্ আমার ইচ্ছা না। যা, তুই বাইরে যা।' সারদা প্রায় ঘুরে দাঁড়ায়।

'তুই পাগলামী করছিস, সারদা।'

সারদা ঘুরে দাঁড়াল। 'মোটেই না। আমি সিরিয়াস্‌লী বলছি, you should not come in. যা চলে যা এখান থেকে।'

'আমি যাব না।' দক্ষিণা হিরণের দিকে তাকালো ঠোঁট মুচকে হাসছে ও।—'কি হলো হঠাৎ, কি নিয়ে ঝগড়া করছেন দু'জন দাঁড়িয়ে?'

সারদা ওর চোখের দিকে তাকায না, যেন আরও বেশি উত্তেজিত হয় সে দক্ষিণার ওপর।

'দক্ষিণা, প্লীজ গেট আউট।'

'নো, আই মাস্ট নট্' ময়লা রুমালটা দিয়ে দক্ষিণা মুখ মুছবার চেষ্টা করে। 'আমিও থাকব।'

'তুই বাড়াবাড়ি করছিস দক্ষিণা। গেট্ আউট।' সারদা প্রায় চীৎকার করে উঠল।

'এই, ভদ্রতা রাখিস, সারদা, গায়ে হাত দিসনে।' দক্ষিণা জোরে চীৎকার ক'রে উঠল। এই সারদা—'

'আশ্চর্য, আপনারা করছেন কি, শেষটায় চেঁচামেচি সুরু করলেন আমার কম্পাউণ্ডে ঢুকে—'বলে ছুটে আসছিল হিরণ হঠাৎ থেমে গেল। ভয় পেল।

'স্কাউন্‌ড্রেল, স্কাউন্‌ড্রেল।' হিস্ হিস্ করছে—দক্ষিণা ছুরির ঘা খেয়ে।

সারদার হাতে একটা পেন-নাইফ।

সিল্কের রুমাল দিয়ে ছুরির ফলাটা বেশ ভাল করে মুছে সারদা আবার সেটা পকেটে পুরল। ওটা কেন সঙ্গে এল, কি করে তার পকেটে ঢুকেছিল, সারদা ভাবল একবার, তারপর হিরণের চোখে চোখে তাকালো।

'আপনার ডিউটি আপনি ক'রে যান।' সারদা প্রফুল্ল হবারই চেষ্টা করল। 'এম্বুলেন্স ডেকে আর কি হবে, টেলিফোন থাকলে বরং থানায় খবর দিন, আমি, পালাচ্ছিনে।'

'এ আপনি করলেন কি।' হিরণ আর একবার মাটির দিকে তাকায়ঃ রক্তের নদীর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা, কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

রিষ্টওয়াচে সময় দেখে হিরণ ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে চলল টেলিফোন করতে।

বুঝি খরগোসটা সারদার পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল। সারদা এমন জোরে ওটার পেটে লাথি বসায় যে, ওটা দূরে ছিটকে পড়ে, চোখ ফিরিয়ে হিরণ তা দেখে। তারপর দু'হাতে খোপা ঠিক করতে করতে পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হয়।

পালিশ

বৃষ্টি নামল পরদিন বিকেলে। একটা বাড়ির পড়ো বারান্দায় আমরা আশ্রয় নিয়েছি। ঠিক সে-সময় ওর কথা শুনে লজ্জা পেয়েছিলাম কেমন।

আগের রাত খুব গরম ছিল। গ্রীষ্মকাল। দশটা বেজে গেছে। সব ক'টা বেঞ্চি প্রায় খালি হয়ে গেছে। হাওয়া খেতে এসে সারারাত ত আর মানুষ পার্কে কাটাতে পারে না। নিয়মও নেই। যেন শুনছি হাওয়া-খোরদের খেদিয়ে দিয়ে পার্ক শূন্য করবার জন্যে চাবির গোছা বাজাতে বাজাতে দরোয়ান ওদিকে এসে গেছে।

বৈশাখের কালো কঠিন তারা জ্বল্ জ্বল্ আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। প্রার্থনা জানালাম মনে মনে পবনদেবতাকে। এক পল্‌কা ঝির্‌ঝিরে হাওয়া দাও, একবার। তোমার ভাণ্ডার কিছু ফুরিয়ে যাচ্ছেনা। আমাদের জন্যে আছেই ত বাকি রাত। দেয়ালের অন্ধকার আগ্‌লে কাটা-ছাগলের মত ছট্‌ফট্ করা। আমাদের দুর্ভোগ আমাদের শাস্তি।

পায়ের ওপর কি হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অন্ধকারে বোঝা গেলনা কুকুর কি মানুষ। রাস্তার পাগল-টাগল!

'কে তুই,' পা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করি।

'বাবু, পালিশ—' পা আরো চেপে ধরে।

'এত রাতে পালিশ কিরে?'

'আচ্ছা ক'রে করে দেব, একদম আয়না মাফিক।'

'অন্ধকারে তোর আয়না মালুম হবে ভারি' হেসে বললাম, 'সারাদিন করছিলি কি?'

চুপ করে রইল ছেলেটা। গলার স্বরে আন্দাজ করলাম বয়স বারো তেরো। 'দিনের বেলায় কোথায় বসেছিলি?'

'হেই মোড়ে।'

'তা'লে ত রোজগার ভালই হয়েছে, অনেক বাবু সারাদিন সেখানে বাস ধরে।' একটা বিড়ি ধরালাম, আর দেশলাইর আলোয় দেখলাম পায়ের ওপর হাত রেখে ও আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। কেমন কষ্ট হ'ল।

'থাকিস কোথা?'

'বেলেঘাটা।'

আর সেই মুহূর্তে শুনলাম, অনুভব করলাম পায়ের জুতোর ওপর সপ্ সপ্ শব্দ। বুরুশ চলেছে। মানে আমার কথার কোন জায়গায় প্রশ্রয়ের সুর ধরে ফেলেছে। ব্যর্থ হতে দেয়নি তা।

'এত রাতে বেলেঘাটা ফিবে যাবি নাকি!'

'না:'—জুতোর কালির কৌটো খোলার শব্দ কানে এল।

'তোর নাম কি?'

'মন্নু।'

আঙ্গুলের ডগায় কালি নিয়েছে কতটুকু অন্ধকারে টের পাইনা, কালি ঘসার কায়িক ক্লেশে ছোঁড়াব ক্রুটী ছিলনা একথা আজও স্বীকাব কবি।

'আমাদের বস্তি তুই দেখেছিস বাবু?' হঠাৎ ও প্রশ্ন কবল।

'কিসের বস্তি?' পরে বললাম, 'না, সারাদিন অফিস কবে কুল পাইনা বস্তি দেখা হয আর কখন।'

'ভারি গোলমাল, বহুৎ হাঙ্গামা।'

'কি হাঙ্গামা?'

'সুখন লাল তেল-কল করবে, আমাদেব হুকুম দিয়েছে জমিন ছাডতে হবে, বস্তি থাকবেনা।'

ভাল। সুখনলাল অর্থবান। জায়গাব দবকার ওর তেল-কলের, অন্য কোথাও যদি থাকবার জায়গা হয় তাদের, নতুন জমিব ওপর নতুন বস্তি ওঠে ত মন্দ কি। বললাম, 'তোদেব আপত্তিটা কি?'

'আলবৎ' ছুবীব ফলার মত লিক্‌লিকিয়ে উঠল ছেলেটার গলা, 'জমি দিয়েছে কেউ আলাদা আমাদের? না, তুলেছে নতুন ডেরা? রাতারাতি তোরা উঠে যা বস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হবে, লম্বা গলা। জুলুম।'

—'তোরা করবি কি?'

'লড়েঙ্গা।' বললে সে গলা উঁচু করে, 'আমরা জমি কামড়ে পড়ে থাকব। দোসরা বস্তি না হলে আমবা যাব কেন?'

সেই সুর। সেই নিশান। রাতদিন এই আওয়াজ।

কতক্ষণ চুপ কবে থেকে বললাম পরে, 'তোর বাপ আছে?'

'আছে।' গলা খাটো করল সে এবার।

'তোদের মুলুক কোথা?'

চুপ করে রইল। এ প্রশ্ন আপনিও করতেন, আপনারও সন্দেহ হ'ত। চুপ থেকে শেষে আস্তে আস্তে বললে, 'মুঙ্গের জিলা।'

দূরে অন্ধকারে গ্যাসের সবুজ আলোটার দিকে চেয়ে থেকে আবার একটা কথা ভাবলাম।

তখন নিজে থেকেই ছেলেটা বলছে, 'আমার মা বাঙ্গালী আছে বাবু।'

দূরের আলো থেকে দৃষ্টিটা গুটিয়ে পায়ের অন্ধকারের কাছে এনে জড়ো করলাম। 'তোর বাপ কোথা, করে কি?'

'কিছু করেনা।' বলে এমন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল যা ওর বয়সের পক্ষে বেমানান।

'কিছু করে না অর্থ কি', ঢোক গিলে বললাম, 'তোর মা আছে?'

'ওই ত, ওকে নিয়েই ত আমরা পারলাম না।' কেমন সেয়ানা সুরে ছেলেটা কথা বলে, 'মা চলে গেছে বস্তি ছেড়ে। কারবালা ট্যাঙ্করোডে করিমদ্দির পাকাবাড়িতে এখন থেকে পাকাপাকিভাবে থাকবে বোঝা গেল।'

'পাকাপাকি ভাবে—?' দাঁতের সঙ্গে কথাগুলো কেমন যেন জড়িয়ে গেল।

'হুঁ বাবু, করিমদ্দির পয়সা দেখে বেটির শির ঘুরে গেছে।'

বলে ও হাসল। কোমল কিশোর গলা বিদ্রূপের, বিক্ষোভের মোচড় দেওয়া মোটা হাসিতে খন্‌খনিয়ে উঠল। ওর বাপ আগে সাবান ফিতা ফেরি করত। ধারে মাল আনত করিমদ্দির ক্যানিং ষ্ট্রীটের দোকান থেকে। প্রথমে খাতির তারপর জবরদস্তী। বাপ ঘরে না থাকলেও করিমদ্দি অনেকদিন তাদের ঘরে ঢুকেছে। ঘরে থেকে কেউ ইসারা না করলে, আস্‌কারা না দিলে বাইরের মানুষ ঘরে ঢোকে না কি। কদিন পর সুরু হল কথায় কথায় চোখের পানি ফেলা। চাউলে কাঁকড পাথর, পরণের কাপড ছোট, ছেঁড়া। শুনেছে মন্নু, মন্নুর বাপ। বাপ দরদ করে সাদি করেছিল, বুডি মা রাজাবাজারে খোলার ঘরে থেকে মুড়ি বেচত। তার শোধ, তার পুরস্কার। ফর্সা দিনের বেলা সেদিন বাপ-বেটার চোখের সামনে দিয়ে বেটি করিমদ্দির পিছু পিছু চলে গেছে। দেখেছে সারাটা বস্তির লোক। আর টিটকারী দিয়েছে মন্নুর বাপকে। বাঙ্গালীনী সাদি করে জিতে গেছলি। দ্যাখ বজ্জাতি। বোঝ এখন কেমন হারামি খেয়েছিলি। সে পর্য্যন্ত বাপ এখন মন্নুকেও দেখতে পারেনা। তার গতরে

দোষি রক্ত। বাপ কাজকর্ম সব ছেড়ে দিয়ে দিনরাত এখন নেশা করে। আবোল তাবোল বকে। মন্নু চুপ করল।

চমৎকার, সুন্দর মনে রাখবার কাহিনী।

বললাম, 'তোর হয়েছে?'

'হাঁ বাবু।' কৌটো বুরুশ গুটিয়ে ফেলল চট্‌পট।

'আয়, রাস্তার ঐ আলোর নিচে, পয়সা দেব।' উঠে দাঁড়ালাম। আর হাঁটবার সময় টের পেলাম ও ঠিক পিছনে আসছে।

গ্যাসের তলায় দেখলাম এবার। কচি ফুটফুটে মুখে ছিটে ছিটে বসন্তের দাগ। শুকনো, শীর্ণ। গেঞ্জির কাপড়ের চেয়ে ছেঁড়া-ছিদ্র সংখ্যা বেশি; পরণে ময়লা জিরজিরে কাপড় কি লুঙ্গি বোঝা গেলনা।

'বখশীস দিবি বাবু।'

'তা দেব' হেসে একটা দু'আনি ওর হাতে দিই। 'এই রাতে এখন যাবি কোথায়?'

'ওখানে শুয়ে পড়ব। কাল রাতে ত ছিলাম।' রাস্তার ওপাশে অন্ধকারে একটা বাড়ির বারান্দা আঙ্গুল দিয়ে দেখাল।

'ঘরে না ফিরলে তোর বাপ খুঁজবে না?'

'ভারি ত বাপের দরদ' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ো মানুষের মত ও হাসল। 'সারা দিন মেহেনৎ করে পয়সা কামাই আর ঘরে বসে বেটা লম্বা কথা কয়। কত রোজগার হল। দে আমার হাতে। বস, হাতে পয়সা পড়েছে কি ছুট সরাপের দোকানে। আর আমি ঘরে গেছি না? কোথায় পয়সা পায় আর সরাপ খায় শালা এখন দেখা যাবে।'

স্তব্ধ হয়ে শুনলাম। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। বুঝি ওটা শেষ বাস। প্রচুর ধুলো উড়িয়ে ঘড়ঘড় শব্দ করতে করতে সামনে দিয়ে চলে গেল।

'একটা বিড়ি দিবি, বাবু?' দাঁড়িয়ে থেকে বার বার এ জন্যেই ও আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। বিড়ি দিতে খুশী হয়ে সেলাম জানাল, তারপর বিড়ি টানতে টানতে রাস্তার ওপারে চলে গেল।

আমি বাঁ দিকের গলিতে ঢুকব এমন সময় ছেলেটা ভারি ব্যস্ত হয়ে আবার ছুটে এসেছে।

'তোর কাছে বাতি আছে, বাবু?'

'কি হ'ল আবার?' বললাম, 'দেশলাই আছে, বাতি পাব কোথা।'

'শালী আজ আবার আস্তানা গেড়েছে।'

'কি বলছিস, শালী আবার কে, কোথায় ?'

'হুই বারান্দায়। কাল শেষ রাতে জেগে দেখি আমার গা ঘেঁসে 'হারামজাদী আচ্ছাসে শুয়ে আছে।'

ব্যাপার কি দেখবার জন্যে মন্নুর পিছু পিছু গেলাম। সামনে একটা ডাষ্টবিন আর উপুড় করা কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্স গোটা দশ বারো। দেশলাইর কাঠি জেলে তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে কোন-মতে বারান্দার সিঁড়িতে ওঠা গেল। দেয়াল ঘেঁসে শুয়ে আছে একটা কুকুর। পঁচা ঘা থেকে রক্ত পুঁজ টস্‌টস্‌ করে সিমেণ্টের ওপর পড়ছে। জিহ্বা দিয়ে ঘা চাটছে কুকুরটা আর যন্ত্রণায় কঁকাচ্ছে।

'এখন করবি কি ?' ওর মুখের দিকে তাকাই।

'আমার নসীব খারাপ।' মন্নু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটু চুপ থেকে পরে বললে, 'ওখানেই শুয়ে পড়ব আর কি।' আঙ্গুল দিয়ে নিচে পেভমেণ্টের একধারে বকুল গাছের গুঁড়িটা দেখাল।

'তাই কর। বেশ হাওয়া পাবি।' মনে খুব কষ্ট হলেও মুখে সান্ত্বনা জানাই। আরেকটা কাঠি জ্বালালাম। পা দিয়ে শুকনো পাতাগুলো সরিয়ে দিযে মন্নু তার কাঠের বাক্সটা শিযরে রেখে লম্বা হয়ে গাছতলায় শুয়ে পড়ল। বললে, 'গরমের বাত হুট করে কেটে যাবে।'

'আমি যাই এবার, কেমন ?'

'যা বাবু, তোকে কষ্ট দিলাম।'

'আরে পাগল।' কষ্টবোধটা অন্যকারণে হচ্ছিল তা কি সে বোঝে না ? একপা একপা করে রাস্তায় নামতে যাব এমন সময় আবার ও পেছন থেকে ডাকল। ঘুরে দাঁড়ালাম।

'কি ?'

'কাল আমাদের বস্তিতে যাবি ?'

'কেন ?' বলে থেমে গেলাম হঠাৎ।

'বললাম যে ভারি গোলমাল বহুৎ হাঙ্গামা।' এত সব কথার ভিড়ে প্রসঙ্গটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছল, খুঁজে পেয়েছে মন্নু।

'পরশু মিটিং হয়ে গেল, কাল ফের হবে, অনেক বাঙ্গালীবাবু আমাদের দলে, লাল ঝাণ্ডা উঁচু রাখব, বস্তি ছাড়বনা, যাবি বাবু ?'

উত্তর ছিলনা আমার মুখে।

তখন সত্যি যেন অল্প অল্প বাতাস দিয়েছে। ঘাড়ের পেছনটায় কান দুটোয় ঠাণ্ডা লাগছে। পাতার শব্দ শুনলাম মাথার ওপর।

'আমরা দোস্‌রা জমিন না পেলে এক পা নড়বনা।'

শুনলাম অসহিষ্ণু রক্তের কলরোল, ছোট্ট একটা দেহে বিক্ষোভের লাল আগুণ। শোয়া থেকে মন্নু উত্তেজনায় উঠে বসেছে। অন্ধকারে চোখ দুটো ওর দেখলাম না।

'যাব যাব,' বললাম মুখে, আর ভাবলাম মিটিং যখন বসবে তখনো আমি ব্যাঙ্কের লেজার ছেড়ে উঠতে পারবনা হয়ত। হয়ত জানালা দিয়ে দেখব সভা সাঙ্গ করে এখন ওরা নগরীর রাস্তা প্রদক্ষিণ করে চলেছে। হাতে লাল ঝাণ্ডা আর থেকে থেকে সেই ধ্বনি।

'যাব আমি তুই এখন ঘুমিয়ে পড!' প্রবোধ দিয়ে রাস্তায় নামলাম। ঘাড ফিরিয়ে লক্ষ্য করলাম অস্পষ্ট সেই ছোট্ট ছায়া-মূর্তি। অন্ধকারে বসে আছে চুপচাপ গাছতলায়। ভাবছে।

না, না পারুক সে বস্তিতে নিজের ঘরে গিয়ে রাত্রে একটু মাথা গুঁজতে। বাপ পয়সা কেডে নেয় মদ খেতে, খেয়ালী মা ছেড়ে গেছে ওকে। এসব নিজের কথা। ব্যক্তিগত। এখন ওর কাছে বড দল। অগ্রণীর বঞ্চনা। বিদ্রোহের ঘূর্ণাবর্তে অভিমানের বুদ্‌বুদ্‌ ওঠেনা।

বলতে কি পরদিন বেশ একটু ভয়ে ভয়ে, নির্দ্দিষ্ট সময় পার ক'রে,— কিছুটা ইচ্ছা ক'রেই দেরি ক'রে পার্কে ঢুকেছিলাম। কে জানে হয়ত ছেলেটা সত্যি আবার আমার জন্যে বসে থাকে কি না। চল্‌ বাবু চল্‌। সময় হয়ে গেছে। যদি হাত চেপে ধরে, যদি আর দশজনের সামনে আমার পূর্ব-রাত্রির প্রতিশ্রুতির কথা সরবে ঘোষণা করে দিয়ে টানাটানি সুরু করে দেয়। লাল ফিতা বেঁধে-বেঁধে হাতে কডা পড়ে গেছে লাল-পতাকা বইবার মত শক্তি আছে নাকি।

বরঞ্চ কষ্ট হয়েছিল ওর স্বল্প-পরিসব জীবনের দুঃখে ভরা কাহিনী শুনে। আশ্চর্য্য মা, অদ্ভুত বাপ। কারবালা ট্যাঙ্ক-রোডে ও এক-আধ দিন গিয়েছে? এবং নিরিবিলি, বেঞ্চির কোনায় বসে যদি আরো কিছু বলত ও আমি কান পেতে শুনতাম। এমন কি পালিশ জুতা আবার পালিশ করবার ছলে আরো দুচার আনা দিতে আমার বাধত না।

লড়াই হাঙ্গামা বক্তৃতা ধ্বনি, তাইত! তাই কেমন যেন অপরাধী হ'য়ে চুপচাপ বসেছিলাম আর ভাবছিলাম। আমি ছোট ও বড়। আমাদের নিয়ম-মাফিক রুটিন-বাঁধা পরিমিত পরিশোধিত জীবন। ওরা তা চায়না। দেখেছে মেঘের আনাগোনা না-কি লাগল ঝড়ের দোলা। এখন থেকে শুনছি মন্নুর চিৎকার, দুর্বার রণ-হুঙ্কার। আমার মনের চোখে ভেসে উঠেছে তেজোদৃপ্ত উদ্ধত অসহিষ্ণু কিশোর-মূর্ত্তি। বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ হয়ে ওরা পৃথিবীতে এসেছে। আপোষ-রফা চায়না, সুখনলালদের কোন-ঠাঁসা করে দেবে, সুখনের বংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে পৃথিবী থেকে। তারপর শান্তি তারপর বিশ্রাম। হয়ত সেদিন সে আবার পার্কের কোনায় এসে বসবে দুঃখের কাহিনী বলতে। এখন অবসর, এখন অখণ্ড সময়,—না, সেদিন,—বলার মত শোনাবার মত দুঃখের কাহিনীরও যে অবসান হবে। পয়সার লোভ দেখিয়ে কোন করিমদ্দি কোন গরীব মন্নুর গর্ভধারিনীকে ঘর-ছাড়া ক'রে নিয়ে যেতে পারবেনা,—ইতর বিশেষ বলতে কিছু যে আর নেই। সব সমান সর্বত্র শান্তি, চারদিক সমুজ্জ্বল। তাই বল, সেই উজ্জ্বল অদ্ভুত প্রভাতের সুচনা করবার জন্যেই ত দলে দলে যাত্রা করছে এরা। ব্যক্তিগত ছোট ছোট দুঃখের মশাল জ্বালিয়ে। দুঃখের অপচয় করবেনা এখন।

বেঞ্চির পিঠে হেলান দিয়ে বসে বসে এসব ভাবছিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে বেলা তিনটের পর থেকে। সবাই বলাবলি করছে আজ বৃষ্টি না হয়ে যায়না। কাগজে দেখেছি কাল আট ডিগ্রী উঠেছিল উত্তাপ। আজ যে-রকম অবস্থা দশ ডিগ্রীতে গিয়ে ঠেকবে। কেবল আঃ উঃ ছট্‌ফটানি সকলের চোখে মুখে। হাতপাখা হাতে হাতে তালপাতার, কাগজের, কার্ডবোর্ডের। আর পার্কের এমাথা থেকে ওমাথা চাই বরফ, কুলপিমালাই, আইস্‌ক্রীম, আনারস। গাছের একটা পাতা নড়ছেনা।

সেই দগ্ধ অস্বস্তিকর মুহূর্ত্তে একটা জলতরঙ্গের মত ঠাণ্ডা মিঠে শব্দ শুনে চমকে উঠলাম যেন আমরা। আমরা মানে বেঞ্চিতে যে ক'জন অফিস-ফেরৎ ক্লান্ত খিন্ন কেরানী পাশাপাশি চুপ ক'রে বসেছিলাম।

ও-দিকটা আলো ক'রে বসেছেন মহিলাটি। সিন্দুর গোলাপী আভা। ফুলের পাপ্‌ড়ির মত ফুটফুটে দুটো ছেলে মেয়ে। প্রশান্ত জমকালো একটা কুকুর। গেছে ছুটে সেখানে বরফ আইসক্রিম সরবৎ আনারসের দল। চকোলেট চিনেবাদাম। বেলুন কাগজের ডল। নিজের হাতে ছেলের হাতে

তুলে দেন এটা, মেয়ের হাতে দেন ওটা। হাতে চামড়ার ব্যাগটা আর বন্ধ হয়না। তারপর সুন্দর গর্বের ভঙ্গিতে আরেকবার হেসে ওঠেন, 'থাক বাপু, অত জোরে ঘসতে হয়না, এমনি ত বেশ চক্‌চকে হয়েছে'।

'একদম আয়না মাফিক করে দেব', ঘর্মাক্ত লাল মুখে মন্নু কুকুরের গলার বেল্টটা বাঁ হাতে চেপে ধরেছে, উদ্যত বুরুশ ডান হাতে।

'এক জায়গায় অত মেহনৎ করলে দোস্‌রা জায়গায় কাজ করবি কি করে?'—স্নিগ্ধ সহানুভূতিব হাসি মহিলাটিব মার্জিত চোখে।

কিছু বলে না মন্নু। মিটিমিটি হাসে আর এক মনে কাজ কবে। বেল্ট্ ছেড়ে ছেলেমেযেদের জুতো, তারপব ওর স্যাণ্ডেল।

গাডী পর্য্যন্ত মন্নু সঙ্গ নিয়েছিল কিনা বলতে পারি না। এমন আচম্‌কা বাতাস আরম্ভ হবে আর চাবদিক অন্ধকাব করে ধূলোব ঝড় উঠবে কে জানত।

পার্কেব বেডা ডিঙ্গিযে ছুটতে ছুটতে গিয়ে আশ্রয নিলাম সেই পডো বারান্দায়। আর আকাশ ভেঙ্গে লক্ষ লক্ষ ধাবায তখন বৃষ্টি নেমে এলো। জলে ভিজে টুসটুসে হযে মন্ন ও সেখানে একসময়ে এসে দাঁডালো।

না, রাত্রির অস্পষ্ট আলো-অন্ধকাবে কাল যদি বা সে আমাকে দেখেছিল, আজ মনে নেই, ভুলে গেছে ভাবলাম, কেননা কালি বুরুশের বাক্সটাব ওপর বসে দিব্যি একমনে পুটপাট চিনে-বাদাম ভেঙ্গে মুখে দিচ্ছে মন্নু। একবাব আমাব দিকে তাকায় না পর্য্যন্ত।

কথা বললাম নিজে যেচে।

'তোদের সভা আজ হয়েছে?'

'ও ত বোজ হয়।' মুখ তুলে কথাটা একবার বলে ফের ও বাদাম চিবোয়।

অবাক হই না। ছেলেমানুষ অতশত সভার কি আর খোঁজ রাখে না ধার ধাবে। চুপ কবে থাকি। কেমন যেন খাপছাড়া মনে হয়, আলাপ জমছে না।

'আমার জুতোটা ধূলোয় কি হয়েছে ত্যাখ', বললাম বেশ দরদ দিয়ে, 'দিবি বুরুশ করে আজ আবাব!'

'ফাটা চামড়া আর কত পালিশ হবে', বলে মন্নু যেন অনেকট সান্ত্বনার সুরে অল্প হাসলো।

লজ্জা পাই,—না এ আর লজ্জার কি, জুতো আমার প্রায় ছিঁড়ে-গেছে ফেটে গেছে যখন। তা ছাড়া অতগুলো জুতা স্যাণ্ডেল কুকুরের বেল্ট্ এই সবে পালিশ করে নিশ্চয় ভাল রোজগার করে এসেছে সে। পরিশ্রমও ত হয়। ঐ ত শরীর, কি খায় সারাদিনে!

বললাম, 'জেনানা কত বখ্‌শীস দিলে?'

'আট আনা।' কথা বলে মন্নু গম্ভীর হয়ে বাইরে রাস্তার জলের ধারার দিকে চেয়ে রইল।

না, আট আনা এমন কিছু মোটা বখ্‌শীস না। আরো দিতে পারতেন মহিলাটি, আবো দেওয়া উচিত ছিল। ভাবলাম না কি এ জন্যেই মন্নু এমন গম্ভীর এমন ভার ভার হয়ে আছে। পর্য্যন্ত আমার জুতোটা ধরবার আর ওর ইচ্ছা নেই। অভিমানে!

একটা বাদাম মুখে তুলতে গিয়ে হঠাৎ হাত নামালো মন্নু। বললে, সে আমাব মুখের দিকে চেয়ে, 'তুই জেনানাকে দেখেছিলি, বাবু?'

মাথা নাড়লাম।

'বাঙ্গালী জেনানা খুব খপ্‌সুরত', সেযনা শক্ত গলায় ও আমার দিকে চেয়ে বলে, 'আমি বাঙ্গালীনী সাদি কবব।'

অন্যদিকে চোখ সরিযে নিলাম তখন।

———

খুনী

লেকের ধারে বেড়ানো প্রসন্নবাবুর চিরকালের অভ্যাস। রিটায়ার্ড জীবন। বেলা তিনটের পর চা খাওয়া হয়ে গেলে তিনি আর বড়ো একটা বাড়ীতে বসে থাকতে চান না। ভালো লাগে না। তাঁর মন ছটফট করে কতক্ষণে বাইরে পা বাড়াবেন। গায়ে পাঞ্জাবী চড়িয়ে চটি ছেড়ে কিড্‌স-এর মধ্যে পা ঢুকিয়ে বেতের মোটা ছড়িটা হাতে নিয়ে তিনি গুটি গুটি বেরিয়ে পড়েন।

অনেকক্ষণ বেড়ান প্রসন্নবাবু লেকের ধারের রাস্তা ধরে এবং অধিকাংশ সময়েই একলা। একটু বেলা পড়তে অবশ্য লেকের পাড়ের সেই সুন্দর নির্জনতা নষ্ট হয়ে যায়। ভিড় আর ভিড়। নানা বয়সের নানা চেহারার। নারী, পুরুষ, শিশু, বালক-বালিকা। এবং যেখানে ভিড় সেখানে ফেরিওয়ালা। একটি না হাজারটা। প্রসন্নবাবু উত্যক্ত হয়ে ওঠেন। এত লোক, এত হট্টগোল তিনি যৌবনেও বরদাস্ত ক'রতে পারেননি। এখন তো নয়ই। তার ওপর ইদানিং তাঁর ব্লাড প্রেসার একটু বেড়েছে। যতটা সম্ভব লোক এড়িয়ে, লোকের কথা এড়িয়ে যেন অনেকটা চোরের মতন তিনি নিজের মনে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে ভিড় কম গণ্ডগোল নেই এমন একটা জায়গায় চলে যান। সঙ্গে ল্যাজ নেড়ে চলে কুকুরটা। প্রসন্নবাবুর নিজের কুকুর। জিম। নামকরণ তাঁর পুত্রবধু সুধাময়ীর। বলতে কি শ্বশুর মশায় একলা এই বয়সে এতটা পথ হেঁটে বেড়ান, সুধাময়ীর কিছুতেই সেটা মনঃপূত নয়। এবং নাতিনাতনি এমন কি বাড়ীর এক আধটা ছোকরা চাকরবাকর পর্যন্ত তিনি সঙ্গে নিতে চান না। ভয় হয়, ব্লাড প্রেসারের রোগী তো বটেই, তার ওপর বুড়ো হয়েছেন, কখন কি হয় একলা রাস্তায়ঘাটে চলতে গিয়ে। তাই সুধাময়ী, অনেকটা শ্বশুরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলোবার নিজে নিউ মার্কেটে গিয়ে পছন্দ ক'রে সুন্দর কুকুরের বাচ্চাটা কিনে এনেছিলেন। এখন আর অবশ্য বাচ্চা নেই। জিম্ বড়ো হয়েছে। মুখটা সাদা শরীরটা কালো। জিম-এর শরীরে যৌবনের লাবণ্য এসে গেছে। সেই জন্যে তো বটেই, এর সঙ্গে পুত্রবধু সুধাময়ীরও শ্বশুরের প্রতি স্নেহ ভালবাসা, মমতা ও চিন্তাকুলতার একটা বড়ো চিহ্ন জড়িয়ে আছে ব'লে

প্রসন্নবাবু জিমকে সঙ্গে নিয়ে যখন হাঁটেন অত্যন্ত আনন্দ পান। কুকুরটাকে এই ক'মাসে তিনি বড়ো বেশি ভালোবেসে ফেলেছেন। কিন্তু ওটা দুষ্টও কম হয়নি। প্রসন্নবাবু হাঁটছেন, হঠাৎ হয়তো ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন পিছনে জিম নেই। কোথায় কোথায়। দেখেন রাস্তা ছেড়ে কখন ওধারে একটা ঝোপের ভিতর গিয়ে কি যেন খুব মনোযোগ দিয়ে শুঁকছে। প্রসন্নবাবু দাঁড়িয়ে পড়েন। জিরোন। হাতের ছড়িটা দিয়ে বাদাম গাছের গুঁড়িতে মৃদু আঘাত করেন। একটা কাঠবিড়াল সরাৎ ক'রে নিচে নেমে ছুটে পালিয়ে যায়। মুখ তুলে প্রসন্নবাবু ওপরের দিকে তাকান। কচি সবুজ পাতার মেলা। সূর্যাস্তের লাল আভায় ঝকমক ক'রছে। একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে প্রসন্নবাবু যৌবনময়ী প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েন। অবশ্য সেই স্তব্ধ বিহ্বলতা তাঁর অনেকক্ষণ থাকে না। ইতিমধ্যে জিম ফিরে এসে প্রসন্নবাবুর গা শুঁকছে। বেতের ছড়ি দিয়ে কুকুরের গায়ে মৃদু শাসনের আঘাত ক'রে আবার তিনি হাঁটেন। এবার জিম আগে তিনি পিছনে। আর দেখেন জিম-এর আগে আগে বেঁটে ছাতা হাতে সাদা নাগরা পায়ে নীল নয়নাভিরাম আঁচল দুলিয়ে একটি মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটি একলা না। আর এক হাতে একটা পেরাম্বুলেটার ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির মধ্যে শিশুটিকে অবশ্য প্রসন্নবাবু ভালো দেখতে পান না। ট্যাঁ ট্যাঁ কান্নার মৃদু রেশটা শুধু কানে ভেসে আসে। আর শুনলেন মায়ের,—মা ছাড়া আর কে হবে, মিষ্টি শাসনের গলা: 'তুমি চুপ করো, বুবু, তুমি কান্না থামাও, আমি আকাশের ঐ কালো পাখিটা তোমায় এনে দেবো।'

মা। স্বাভাবিক সরল দিকটাই আজ ঘাটের ঘরে পা দিয়ে প্রসন্নবাবু বেশি চিন্তা ক'রছেন।

তাই। স্বাভাবিক অস্বাভাবিক। শুভ অশুভ। সারা জীবন সব দেখতে দেখতে এখন এমন এক জায়গায় এসে তাঁর মন স্থিতি পেয়েছে যে, প্রসন্নবাবু কিছুতেই সেখান থেকে মনকে নাড়াতে পারছেন না। পারছেন না কেন না অসুন্দর অস্বাভাবিক অশুভ দিক-এর অস্তিত্ব আছে বিশ্বাস ক'রতে গিয়ে জীবনে তিনি অত্যন্ত ঠকেছেন। আছাড় খাওয়া অভিজ্ঞ মন আর ঠকতে রাজী নয়।

তাই জীবনের অনেক কথা মনে ক'রে প্রসন্নবাবু সব কিছুর ওপর একটা

মঙ্গল মধুর প্রলেপ বুলিয়ে,—অথবা বলা যায় তাঁর প্রেমহীন পাতলা সিলিণ্ড্রিক্যাল লেন্স দুটোর ওপর একটা শুভ্র পাউডারের আস্তরণ দিয়ে তারপর একটা জিনিসের ওপর নজর রাখেন। একটি মুখের দিকে তাকান। এইভাবে তাকিয়ে শান্তি পান। হয়তো একটু ঝপসা দেখেন কিন্তু তা হ'লেও ওটা একটু ভালো, আনন্দের। এবং ঈশ্বরও তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখের দ্যুতি কমিয়ে দেন। মানুষ এবং আর সব জীবের।

রাস্তার বাঁক পড়তে মা ও শিশু অদৃশ্য হয়। একটা বড়ো পাথরের টুক্‌রো প্রসন্নবাবুর সীমানা। তার ওদিকে বড়ো একটা যান না। এখানে এসে একবার শুধু দাঁড়ান। দাঁড়িয়ে ডান দিকে লেকের কালো জল দেখেন। ওপারে আকাশের মেঘ দেখেন। এবং পরিশ্রম বোধ করেন ব'লে পাথরটার ওপর বসে বেতের ছড়িটা দিয়ে একটা দুটো ঘাসের ডগা নাড়েন কি ছিঁড়ে ফেলেন। এ সময়ে এই নির্জনতায় সিগারেট ভালো লাগার কথা। কিন্তু পঞ্চান্ন পার হয়ে প্রসন্নবাবু ধূমপান ছেড়ে দেন। ডাক্তারের নির্দেশ। তা ব'লে খুব যে একটা অসুবিধা হচ্ছে, এখন তো না-ই, সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার অব্যবহিত পরেও প্রসন্নবাবু খারাপ বোধ করেননি। বরং সিগারেটের দরুন আগে প্রতি মাসে যে-টাকা খরচ হ'তো সেটা এখন বেঁচে যাচ্ছে। আর সেই টাকা একত্র ক'রে দুমাস চারমাস অন্তর আজ তিনি নাতি নাত্‌নী কি ছেলে-বৌকে এটা ওটা কিনে উপহার দিতে পেরে একটা গভীর তৃপ্তি অনুভব ক'রছেন। না, খাওয়া-পরা থাকা, দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। প্রসন্নবাবু জীবনে প্রচুর উপায় ক'রেছেন। এখনো তাঁর উপার্জনের স্রোত শুকিয়ে যায় নি। ধারা ক্ষীণ হয়েছে বটে কিন্তু নির্ভুল নিয়মে ফি-মাসে সরকারী পেনসনটি আসছে। বড়ো ছেলে সুকুমার (প্রসন্নবাবু অনেক সময় চিন্তা করেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ না থাকলে কিছু হয় না) শিবপুর বি ই কলেজ থেকে পাশ ক'রে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ভালো চাকরি পেয়েছে। এর জন্যে প্রসন্নবাবুকে মোটেই তদ্বির তোষামোদ ক'রতে ছুটতে হয়নি। ক'রবেন বলে তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন যদিও মনে মনে। এবং কাকে কাকে ধরা হবে শহরের প্রতিপত্তিশালী লোকদের নামের একটা তালিকা তিনি অনেকদিন ধরে নিজের মনে তৈরী ক'রে চলেছিলেন। কিন্তু সে-সবের প্রয়োজন রইলো না। কাজে লাগলো না সেই তালিকা। আপনা থেকে সুকুমারের হয়ে গেল। মেজ ছেলে

স্মরজিতকুমার আছে দেরাদুনে। তারও ভালো চাকরি। তবে মিলিটারি ব'লে কাজটা প্রসন্নবাবুর তত মনঃপুত হয় নি। কিন্তু কি করেন। 'সবাই সিভিল সেজে থাকলে সরকার দেশরক্ষা ক'রবেন কাদের নিয়ে,' কথাটা প্রসন্নবাবু প্রায়ই বাড়ীতে মেয়ে-ছেলেদের কাছে ঘোষণা করেন। কেন না আকাশে উড়ে যুদ্ধ ক'রতে হবে, স্মরজিতের চাকরি হয়েছে শুনে বাড়ীতে প্রসন্নবাবুর স্ত্রী বড়-বৌ কেঁদে উঠেছিলেন। তারপর অবশ্য বোঝাতে বোঝাতে এখন ওদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর স্মরজিৎ সম্পর্কে ততটা হায় আফ্‌শোষ করেন না। যা হোক, যেভাবেই বিচার করা যাক প্রসন্নবাবু মোটামুটি সুখী মানুষ। নিজের কিছু ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আর দুই ছেলের চাকরি। মন্দ চলছে না। তাই মাঝে মাঝে পেনসনের টাকার প্রায় সবটাই খরচ ক'রে ফেলে তিনি সুধাকান্তর স্ত্রী ও তার ছেলেমেয়েদের জামায় কাপড়ে বইয়ে খেলনায় ব্যয় করেন। যেমন সিগারেট খেয়ে তিনি সুখ পেতেন এখন ওটা বন্ধ ক'রে দিয়ে টাকাটা এদের জন্যে ব্যয় ক'রে তার চেয়ে অনেক বেশী পান।

প্রসন্নবাবুর মাথার চুল ছোট ছোট কদমফুলের মতো ক'রে ছাঁটা। সাদা হয়ে গেছে মাথা। এই শ্বেত দীপ্তির সঙ্গে তার গায়ের সদ্য পাট ভাঙ্গা সিল্কের পাঞ্জাবির শুভ্র ঐশ্বর্য অঙ্গাঅঙ্গিভাবে মিলে গিয়েছিলো। পায়ে সাদা কিড্‌স। বেতের ছড়ির হাতলটা আইভরির। প্রসন্নবাবুর মাথার ওপর বৈশাখ অপরাহ্নের যে মেঘখণ্ড ঝুলছিল তা-ও দুধের মত সাদা—

কেবল প্রসন্নবাবুর পায়ের নিচের ঘাস ছিল সবুজ আর পিছনের লেকের অগাধ কালো জল। ভারি মিষ্টি একটা হাওয়া দিচ্ছিল আর মাথার ওপর সাদা মেঘটাকে বলের মত লুফে যেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল।

পরিতৃপ্তির, সজীবতার একটা নিঃশ্বাস ফেলে প্রসন্নবাবু হাই তুললেন। এমন সময় একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট হাসির রেশ তাঁর কানে এলো।

একটু চমকে উঠলেন প্রসন্নবাবু।

সামনে কেউ ছিলো না ব'লে পিছনের দিকে তাকান ঘাড় ঘুরিয়ে। এবং হাসি ও নিচু মিষ্টি গলার কথা শুনতে সেই অবস্থায় আরো কিছুক্ষণ সেদিকে ঘাড়টা ফিরিয়ে রাখেন।

লেকের জল ঘেঁসে ওরা দুটিতে বসে আছে। অস্ত সূর্যের সমস্ত আভা ওদের বিপরীত দিকে আর একটা আকাশে ঝুলছিল ব'লে প্রসন্নবাবু প্রথমটায় দুটো মানুষকে দুটো পাথরের ছায়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে

পারছিলেন না। সূর্য একেবারে ডুবে যাওয়ার পর চারিদিকে আলোর সমতা রক্ষা হ'তে প্রসন্নবাবু এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলেটির সাদা সার্ট পেণ্টুলুন, মেয়েটির পরনে গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ি। এরা ঠিক কারা প্রসন্নবাবু চেনেন না। এই অঞ্চলের কি আর কোঁথাও থেকে লেকের ধারে হাওয়া খেতে এসেছে প্রসন্নবাবু সেদিকে তাকিয়ে থেকে ক্ষণকাল চিন্তা করেন। বস্তুতঃ বলতে কি তাঁর সমবয়সী এবং শিশুদের ছাড়া বেড়াতে বেরিয়ে কি এমনিও যখন তিনি বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকেন কারোর মুখের দিকে বড়ো একটা তাকান না। যুবক-যুবতী প্রৌঢ় প্রৌঢ়া যারাই তাঁর সামনে দিয়ে রাস্তা চলুক। এই স্বভাব তিনি একদিনে আয়ত্ত করেন নি। দীর্ঘদিনের চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা এই সংযত নম্র আনত স্নিগ্ধ গম্ভীর দৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন। ওরা সামনে থেকে চলে যাওযার পর তবে তিনি সৌম্য শান্ত ভঙ্গিতে আকাশ দেখেন কি ওদের পরিত্যক্ত শূন্য পথ। কারো মুখের দিকে তাকানোর উগ্র অশান্ত কৌতূহল সতর্কতার সঙ্গে প্রসন্নবাবু বর্জন ক'রেছেন। তার একটা কারণ মুখ দেখলেই তিনি মন বুঝতে পারেন, চোখ দেখলে হৃদয়ের ভাষা পড়ে ফেলেন। বয়স ও অভিজ্ঞতার অভিশাপ এটা। এবং তাতে, যে সামনে এসেছিলো সে হয়তো চলে গেল, অশান্তি দুর্ভাবনা অস্বস্তি ও আকুলতায় আচ্ছন্ন হয়ে প্রসন্নবাবু বাকি প্রহর কাটান। কেন তার উত্তর নেই; কবে থেকে এটা শুরু হয়েছে প্রসন্নবাবুর নিজেরও ভালো মনে নেই। তবে এরকম যাতে না হয় সেজন্যে তিনি সারাক্ষণ অত্যন্ত হুঁশিয়ার। কি বাড়ীতে এক নিজের স্ত্রী ছাড়া আর কারো মুখের দিকে তিনি তাকান না। সুধাকান্তর দিকে না সুধাময়ীর দিকে না…বড় মেয়ে মুকুলের (বিয়ে হয়ে গেছে) দিকে না, বকুলের (কলেজে পড়ছে) দিকে না। স্মরজিৎ বিদেশে আছে তার চোখে চোখ রাখার প্রশ্ন ওঠে না। তাকান, যতক্ষণ জেগে থাকেন, যতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন তাঁর দু তিনটি নাতিনাতনী অর্থাৎ সুধাকান্তর বাচ্চাগুলোর চোখে চোখ রেখে মুখে গাল ঠেকিয়ে ওদের দেখেন আর ওদের সঙ্গে গল্প করেন। রূপ আর রত্নাকে নিয়ে তাঁর বিশ্বজগত।

আজ হঠাৎ এভাবে এখানে দুটি ছেলে-মেয়েকে দেখে প্রসন্নবাবু চমকে উঠলেন। অত্যন্ত নির্জনতার সঙ্গে এভাবে দুটির বসে থাকার মিল ছিলো ব'লে প্রসন্নবাবু কতক্ষণ সেদিক থেকে ঘাড় ফেরাতে পারলেন না।

যেমন অবাক হয়ে তখন তাকিয়ে রাস্তার পাশের নতুন পল্লবিত অজস্র সবুজ ঐশ্বর্যমণ্ডিত বাদাম গাছটাকে দেখেছিলেন প্রসন্নবাবু। কি বৃষ্টিধোয়া নীল অপরাজিতার মত আঁচলটি পিঠে মেলে দিয়ে সেই যে একটু আগে মেয়েটি পেরাম্বুলেটার ঠেলে নিয়ে গেলো। নতুন মা-টিকে।

এখন এখানেও প্রসন্নবাবু হাঁটুর ওপর একটা কুনুইয়ে ভর রেখে মেয়েটির পিঠ ঈষৎ হেলিয়ে দিয়ে বসে গল্প করবার ছবিটিকে দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হ'লেন। প্রকৃতির অঙ্গ হিসাবে দেখলেন। পিছনে লেকের জল কুলকুল ক'রছিলো। আর কোটি কোটি ঢেউ। চশমাটা সিল্কের পাঞ্জাবির কোণায় মুছে প্রসন্নবাবু আবার চোখে রাখলেন।

কিন্তু দু'মিনিট সেদিকে নজর রেখে বুঝলেন ওরা ঠিক হেসে গল্প ক'রছে না। মেয়েটি হেসে কথা বলছে। কিন্তু ছেলেটি একেবারেই কথা বলছে না, গম্ভীর।

কান পেতে রইলেন প্রসন্নবাবু।

দেখলেন ঘাসের ওপর একটা শতরঞ্চি বিছানো। একদিকে কাপ ডিস, ষ্টোভ, মাখনের কৌটো কাগজে জড়ানো আরো কি কি।

অর্থাৎ দুপুর থেকে ওরা ওখানে নির্জনে কাটাচ্ছে। বিশ্রাম ক'রেছে, চা খেয়েছে দু-একবার, প্রসন্নবাবু অনুমান ক'রে নিলেন।

পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বার ক'রে তিনি কপাল মুছলেন ও রুমালটা আবার পকেটে ঢোকালেন। ছেলের বৌ সুধাময়ী রুমালটা আজ দুপুরে সাবান দিয়ে কেচে পরিষ্কার ক'রে শুকিয়ে ভাঁজ ক'রে তাঁর পকেটে রেখেছিলো প্রসন্নবাবুর মনে পড়লো।

প্রসন্নবাবুর অনুমান মিথ্যা নয়। ওরা দুটিতে ভীষণ ঝগড়া করছিলো। মেয়েটি হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে তার জুতার ফিতে বাঁধলো। তারপর ওপাশ থেকে একটা এটাচি টেনে সেটা হাতে ক'রে উঠে দাঁড়ালো।

'আমি চললাম।'

ছেলেটি জলের দিক থেকে মুখ ফেরায় না।

'আমি চললাম।' মেয়েটি মুখ ভার ক'রে আর একবার ছেলেটির উদ্দেশ্যে কথা দুটো ব'লে সরে এলো। তারপর প্রসন্নবাবুর সামনে দিয়ে রাস্তায় উঠে গেলো।

মেয়েটি অবশ্য প্রসন্নবাবুর দিকে তাকালো না। হয়তো দেখলো না।

পাথরের মতো স্থির সংযত তিনি পাথরের টুকরোটার ওপর ছড়িটা কোলের ওপর শুইয়ে রেখে গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন।

খুব অল্প বয়স মেয়েটির। প্রসন্নবাবু আড় চোখে তাকিয়ে যতটা দেখে বুঝলেন। ঠিক এই বয়সের মেয়ে তাঁর বাড়ীতে একটি থাকে। ছোট মেয়ে বকুল। কলেজে পড়ে। সেই বয়স এই তরুণীর। কুমারী।

একটু পর ছেলেটি এসে প্রসন্নবাবুর সামনে হঠাৎ দাঁড়াতে তিনি খুব বেশি চমকে উঠলেন না।

অত্যন্ত তরুণ। যেন সবে কালো গোঁফের রেখা উঁকি দিয়েছে। সংসারানভিজ্ঞ।

'কি চাই?' প্রসন্নবাবু আগে প্রশ্ন করলেন। 'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম সুদেব। আপনার কাছে একটা টাকাব খুচবো হবে?'

'হাঁ, কেন?' প্রসন্নবাবু শান্তভাবে তকণের মুখের দিকে তাকালেন।

ছেলেটির দৃষ্টি প্রসন্নবাবুব দিকে ছিলো না। তাকিয়ে দূরে ঘাসেব ওপর শূন্য বিছানাটা দেখছিলো। সেদিকে চোখ রাখা অবস্থায প্রসন্নবাবুব সঙ্গে কথা ব'লছে। 'একটা আইসক্রীম খাবো। বড়ো পিপাসা পেয়েছে। আইসক্রীমওয়ালার কাছে টাকার চেঞ্জ নেই।'

'আইসক্রীমওয়ালা গেলো কোথায়? ডাকোনা।' প্রসন্নবাবু এদিক-ওদিক ঘাড ফিবিযে চাবপাশে আইসক্রীম নিযে এসেছে কাউকে দেখতে পেলেন না। তথাপি তিনি পাঞ্জাবিব পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করেন।

ছেলেটি সেদিকে তাকিযে বললো 'আসবে ঘুবে এখুনি। আমি ওকে তখন একটু সরে যেতে বলেছিলাম। বীণার সঙ্গে আমার তখন ভযঙ্কর তর্ক চলছিলো, আইসক্রীম আনার সময ছিলো না।'

'কে বীণা?' প্রসন্নবাবু অত্যন্ত নম্রকণ্ঠে প্রশ্ন ক'বলেন।

'ঐ যে আমি জলের ধারে যে মেয়েটির সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলাম; তারপর রাগ ক'রে উঠে চলে গেলো।'

প্রসন্নবাবু লেকের জলের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলেন।

ছেলেটি একটু সরে এসে ঘাসের ওপব প্রায় প্রসন্নবাবুর গা ঘেঁসে নিজের সুন্দর রুমালখানা বিছিয়ে বসলো। একটা ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

প্রসন্নবাবু ছেলেটির মুখের দিকে তাকালেন।

'আপনি বোধ হয় মনে মনে আমায় প্রশ্ন ক'রছেন, কে এই বীণা ?' ব'লে ছেলেটি ঈষৎ হাসলো।

প্রসন্নবাবু শান্ত নরম গলায় হাসলেন, 'না, তোমরা ওধারে বসে ছিলে আমি দেখিনি। তা ছাড়া এই তো এলাম।'

ছেলেটি ঘাড় নাড়লো।

'দেখলেন তো, কেমন রাগ দেখিয়ে চলে গেলো। আজ আপনাকে বলতে বাধা নেই, ওর জন্যে আমার বারো তেরো টাকা খরচ হয়ে গেলো ট্যাক্সি ভাড়ায়, এটা ওটা খাওয়ায়।'

প্রসন্নবাবু এবার ঈষৎ কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন ক'রলেন, 'এই যে আমার সামনে দিয়ে চলে গেলো ?'

'হ্যা, ঐ বীণা রায়। আমাদের কলেজের প্রোফেসর রায়ের স্ত্রী ?' ছেলেটি বললো, 'ওর পায়ে 'বাটারফ্লাই' জুতো। এ বছরের যেটা মেয়েদের পায়ের বেষ্ট কোয়ালিটির জুতো বেরিয়েছে সেই জুতোও কিনে দেওয়া আমার টাকায়।"

প্রসন্নবাবু অবাক হয়ে তরুণের চোখের দিকে তাকালেন।

'আপনাকে বলতে বাধা নেই স্যর, ইউ আর অ্যান ওল্ড ম্যান। আপনি যদি এতক্ষণ এখানে না থাকতেন তো আমি আজ আপনি যে পাথরটার ওপর বসে আছেন সেটাকে সাক্ষী রেখে ব'লে যেতাম, এই জীবনে আর কাউকে ভালোবাসবো না।'

আবহাওয়া ভয়ঙ্কর থমথমে হয়ে উঠেছিল। প্রসন্নবাবু মুখ তুলে দেখলেন বৈশাখের শুকনো সাদা মেঘের পরিবর্তে বেশ কালো বড়ো একটা মেঘ দেখা দিয়েছে লেকের ওপাড়ে। মনে হচ্ছিলো ওই জল থেকেই মেঘটার উৎপত্তি।

কিন্তু তথাপি কালবৈশাখীর ভয়ে প্রসন্নবাবু পাথরটা ছেড়ে ওঠেন না। স্থির স্থাণুবৎ বসে থেকে ধৈর্যের সঙ্গে সুদেবের ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী শোনেন। পেন্টুলুনের পকেট থেকে আর একটা সুন্দর হলদে ছোপ দেওয়া রুমাল বের ক'রে ছেলেটি তার চোখের কোণা মুছলো। বীণা রায়ের নিষ্ঠুরতা বিশ্লেষণ ক'রতে চোখে জল দাড়িয়েছে।

প্রসন্নবাবু রুমাল দিয়ে চোখের কোণা মুছলেন না, কপাল মুছলেন।

ছেলেটি বললো, 'তাই বলছিলাম, আপনি ওল্ড ম্যান। আমার চেয়ে

বুদ্ধি-বিবেচনা অনেক বেশি। এখন আপনাকে প্রশ্ন ক'রছি আমায় কি ক'রতে হবে একটা পরামর্শ দিন।'

প্রসন্নবাবু প্রায় গলদঘর্ম হয়ে উঠেছিলেন, এই সমস্যার সমাধানের কি উত্তর হবে ভেবে ভেবে। আইসক্রীম খাওয়ার তাঁরও প্রবল ইচ্ছা হ'লো। ছেলেটি চুপ ক'রে পক্ককেশ লোলচর্ম জ্ঞানবৃদ্ধ প্রসন্নবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা ক'রছিলো উত্তরের।

দুজন এককাসে পড়ে কলেজে। সেখানে প্রেমের উৎপত্তি। এখন সুদেব চাইছে প্রোফেসার রায়ের সঙ্গে একটা ডাইভোর্সের মামলা ক'রে সকল সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে বীণা তাকে বিয়ে করুক।

কিন্তু বীণা চাইছে না।

যেন এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পেবে প্রসন্নবাবু আবার ঈষৎ হেসে ব'ললেন 'আমি কিন্তু ওব বিযে হযেছে টেব পাইনি।'

'তা আর কি ক'বে পাবেন। ছেলেটি এবাব দাঁত দিযে একটা ঘাস কেটে ফেললো, বুড়ো হলে মানুষেব চোখেব জ্যোতি কমে যায়। ওর সিঁথিতে সিদুঁব ছিলো। চুল বেশী ব'লে সেটা আপনাব চোখে ধরা পড়েনি।'

প্রসন্নবাবু চুপ ক'রে লেকের ঢেউয়ে কালো মেঘেব নাচানাচি দেখছিলেন। হাওয়া উঠছিলো। বোঝা গেলো ঝড হবে না। মেঘটা সরে যাচ্ছে। ঈষৎ চিন্তা ক'রে প্রসন্নবাবু বললেন, 'আমাব মনে হয় বীণা দেবী যখন ও সব ক'রতে চাইছেন না তোমাব সরে দাঁড়ানো উচিত। আসলে উনি আর এক ভদ্রলোকেব বিবাহিতা স্ত্রী।'

'ওল্ড ফুল।' ছেলেটি প্রসন্নবাবুর দিকে না তাকিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। 'রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আপনার। তাই নীতিব প্রশ্ন তুলছেন। কিন্তু প্রেম-ভালবাসা যে এসবের ধার ধারে না আমি কী ব'লে আপনাকে বোঝাবো।'

প্রসন্নবাবু আড় চোখে তাকিয়ে দেখলেন ছেলেটির ঠোঁটের কোণায় একটা উপেক্ষার হাসি বাঁকা হযে ঝুলছে। ·

একটু সময় নীববতার মধ্যে কাটলো।

মাথার ওপর দিয়ে একটা পাখি উড়ে যায়।

'আমি আজ পরিষ্কারভাবে ওর উত্তর শুনতে লেকের ধারে ডেকে

এনেছিলাম। প্রোফেসার কলকাতার বাইরে গেছে কি কাজে। আমি চেয়েছিলাম আজকের মধ্যেই যা করবার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'রে ফেলবো। এতক্ষণ তাই বোঝাচ্ছিলাম। কিন্তু কিছুতেই তো সে-ধরণের একটা কথার মধ্যে আমি ওকে আনতে পারছি না,—তাই জিজ্ঞেস ক'রছিলাম আপনাকে—'

প্রসন্নবাবু একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে একটা ঢোঁক গিলে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার তো মনে হয় এই প্রেমের চেয়ে ওর বিবাহিত জীবনের মোহটা এখনো অনেক বেশি রয়ে গেছে, স্বামীর সংসারের ওপর টান প্রবল, —কিছুতেই তার মায়া কাটাতে পারছে না।'

'কি করে বুঝি! কি ক'রেই আপনাকে বোঝাই কখন কোন্‌দিকে ওর টান প্রবল হয়। তাই তো বলছি, আপনার কাছে আর ওই বাদাম গাছটার কাছে পরামর্শ চাওয়া সমান কথা। হয়তো আপনি না থাকলে ওই গাছটার সঙ্গে কথা ব'লে আমি আমার দুঃখ জানাতাম। আমি জানি, আমাদের দু'জনের মাঝখানে যে হিমালয়ের মতো সমস্যা মাথা তুলে আছে তার সমাধান আপনার বুড়ো পাকা মাথায় নেই।'

চামড়া কুঁচকে আছে তবু যেন প্রসন্নবাবুর দুকান লাল হ'য়ে উঠলো।

'তুমি মনে মনে কি ঠিক করেছো?'

'সুইসাইড।' প্রসন্নবাবুর চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে সুদেব বললো, 'তার আগে চেষ্টা ক'রবো বীণাকে পৃথিবী থেকে সরাতে। হোক আমার ফাঁসী। আমি ওকে শিক্ষা দিতে চাই।'

লেকের জলের ছলছল শব্দ হচ্ছিলো। প্রসন্নবাবু আবার স্থাণুর মত স্থির। তার মুখে কথা সরছিলো না।

আইসক্রীমওয়ালা এলো। কিন্তু সেদিকে আর কারো মন ছিলো না। লোকটা চলে গেলো। একটু পর ছেলেটিও উঠে আস্তে আস্তে অদূরে ঘাসের ওপর বিছানো শতরঞ্জিটার ওপর গিয়ে আবার চুপচাপ বসে, দুই হাঁটুর ওপর থুঁতনি রেখে জলের দিকে তাকিয়ে ভাবে। প্রসন্নবাবু স্থির হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। দূরে রাস্তায় আলো জ্বলে। রাত হয়। কিন্তু পাথর ছেড়ে তিনি উঠতে পারেন না।

•জানি না, বললে আপনারা বিশ্বাস ক'রবেন কি না এই যে এতক্ষণ বসে প্রসন্নবাবু সুদেবের সঙ্গে কথা বললেন আসলে এটা তিনি এই নির্জনতায় বসে

নিজের সঙ্গে কথা বললেন। এখানে সুদেব ব'লে আর কেউ নেই। সুদেব প্রসন্নবাবু। হ্যাঁ, তাঁর কলেজের অধ্যাপক ভূদেব রায়ের স্ত্রী বীণাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। চল্লিশ বছর আগের ঘটনা। না, আত্মহত্যা বা বীণার জীবননাশের কোন প্ল্যান শেষ পর্যন্ত প্রসন্নবাবুর মনঃপূত হয়নি।

তবে তিনি কি ক'রলেন, বীণাকে নিজের কাছে চিরদিনের মতো পেতে কোন্ পন্থা শেষে তাঁকে অবলম্বন ক'রতে হয়েছিলো নিশ্চয়ই তা জানতে আপনাদের ভীষণ কৌতূহল হবে। যদি ব'লি প্রসন্নবাবু কৌশলে ভূদেববাবু ও তার স্ত্রীকে একবার পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে তারপর ভূদেববাবুকে তিনি ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিয়ে অধ্যাপকের ভবলীলা সাঙ্গ ক'রেছিলেন আপনারা বিশ্বাস ক'রবেন? ইতিহাসের অধ্যাপক ভূদেব রায়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন প্রসন্নবাবু। ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটন ক'রতে সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে অধ্যাপক সস্ত্রীক এবং সশিষ্য নীলগিরি পাহাড়ে বেড়াতে যান। এই করুণ নিষ্ঠুর দৃশ্য বীণা দাঁড়িয়ে দেখলো। খুব বিচলিত হয়েছিলো কি? কি ক'রে তা বুঝবেন প্রসন্নবাবু। কলকাতায় ফিরে এসে স্বামীর শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে যাবার পর বীণাকে প্রস্তাব দিতে ও রাজী হয়ে গেলো। বিয়ে হয়ে গেলো তাদের। তারপর আর কোনো ক্ষোভ অসন্তোষ অশান্তি থাকেনি দুজনের জীবনে। এই চল্লিশ বছরের মধ্যে একদিন তারা অসুখী হননি। হ্যাঁ, এই যে একটু আগে তিনি পাথরটার কাছে আসবার সময় পেরাম্বুলেটার ঠেলে নিয়ে যাওয়া মেয়েটিকে, মা-টিকে দেখছিলেন এটাও অন্ততঃ এখনকার মতো কাল্পনিক। চল্লিশ বছর আগে বীণা ভূদেব রায়ের ঔরসজাত একমাত্র শিশুটিকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোতেন। কি,— সেই শিশু আজ সুধাকান্ত হয়ে প্রসন্নবাবুর সোনার সংসার আলো ক'রে আছে। হ্যাঁ, আর সুধাকান্তর স্ত্রী, প্রসন্নবাবুর পরিবারের মধুক্ষরা একটি জননী। যার ছেলে ও মেয়ে দুটিকে আজ ফেরার পথে তার সিগারেটের জমানো টাকা দিয়ে নতুন রকমের দুটো উপহার কিনে দেওয়ার কথা চিন্তা ক'রছিলেন। চারিদিকে এত স্নেহ এত মধু। তবু, তথাপি বিকেল পড়তে লেকের ধারের লোক ও হট্টগোল ছেড়ে অনেক দূর এসে এই বিরল নির্জন পাথরটার ওপর বসে তিনি চিন্তা করেন অধ্যাপককে খুন ক'রে তিনি কি পাপ করেছিলেন? লোলচর্ম শিথিল হাত দুটো অন্ধকারে চোখের সামনে মেলে ধরে প্রসন্নবাবু বার বার পরীক্ষা করেন এই হাত দিয়ে তিনি কি?—

অথচ এই হাত দিয়ে তিনি বেড়াতে বেরোবার আগে সুধাময়ীর শিশুদের মুখে নিজের বাটি থেকে তুলে সন্দেশ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে সুধাময়ী হাসছিলেন রাগ ক'রছিলেন শ্বশুর কিছু খাচ্ছে না ব'লে।

অন্ধকারে জিম প্রসন্নবাবুর কোঁচা কামড়ে ধরে টানতে তাঁর খেয়াল হয় রাত হয়েছে; এই বেলা উঠে না পড়ল বাড়ী ফিরতে কষ্ট হবে।

মাছের দাম

কিসের টাকা কোন্ দিকে গড়ায় দেখুন। যাক, মাছ দিয়েই আরম্ভ করি।

হ্যাঁ, মাছ। হিসাব করলে দেখা যায় আজ একুশ দিন বাড়ীতে মাছ আসে না। আসতে পারে না। কি করে আসবে। এই প্রথম দিকে বড়জোর তিন কি চারদিন বাজার করা হয়। তখন একটু মাছটাছ শাকসব্জি এটা-ওটা দু'চার পদ কিনে থলে ভর্তি করে, যাকে বলে রীতিমত বাজার করা যদি বা সম্ভব হয়, তারপর থেকে পাড়ার মুদি দোকান ভরসা। ডাল আলু, আলু আর ডাল। তাও মাসের মাঝামাঝি দোকানের হিসাবের খাতায় ধারের অঙ্ক যখন মোটা হয়ে উঠতে থাকে আলুটা আস্তে আস্তে বাদ পড়তে থাকে। তার বদলে একটু পোস্ত। পোস্তর বড়া সর্ষেবাটা ও ডাল। মাসের শেষের দিকে তা-ও না। এবং তখন ডালের-ই-বা কী চেহারা হয়! দেড়-পো'র জায়গায় ছটাক দেড় ছটাক ডাল এক কড়াই জলে সিদ্ধ হয়ে তার রং, স্বাদ কি দাঁড়ায় বৈদ্যনাথবাবু তো বটেই বাড়ীর সবচেয়ে ছোট ভোক্তাটীও তা জানে, দেখে। ডালের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তিন বছরের তিনকড়ি 'মাছ' 'মাছ' বলে চিৎকার ক'রে বাড়ী মাথায় তোলে। বড় মেয়ে দুটো চুপ করে থাকে। তার তলায় ছোট ছেলে দুটো কনিষ্ঠ তিনকড়ির মত মাছের জন্য হৈ হৈ না করলেও রাগে গজ গজ করে আর ডাল মাখা ভাতের গরাস মুখে তুলে চেহারা বিকৃত করে ফেলে। এমন দিনে, এমনি এক দুর্দিনে বড়লোক শ্যালক বাড়িতে আসেন। প্রায়ই আসেন না। না এসে অথবা সারা বছরে যেমন বিজয়ার পরে কিংবা নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে একবার উঁকি দিয়ে বোন ভগ্নিপতি ও বাচ্চাগুলোর সামান্য কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করে বেহালার বড়লোক বিরাজমোহন যেমন হন্তদন্ত হয়ে বাড়ীতে ঢোকেন তেমনি আবার একটা ব্যস্ততা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান। অর্থাৎ কোনরকমে আত্মীয়তা রক্ষা। অবশ্য এই জন্য বাড়ীতে খুব একটা হায় আপশোষও নেই। মামাবাবু গাড়ী হাঁকিয়ে বছর ছ'মাস পর একদিন খালি হাতে এলেন কি বেরিয়ে গেলেন— ভাগ্নেভাগ্নিরা যেমন গ্রাহ্য করে না, তেমনি, বোনের মনেও শোক-সন্তাপ নেই। সে জানে যুদ্ধের বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অনেক টাকাপয়সা জায়গাজমি

গাড়ীবাড়ী করার পরও দাদার আত্মা 'পাই পয়সার' মত ছোট হয়ে আছে। পরিবর্ত্তন নেই। আর বৈদ্যনাথবাবু তো শ্যালক বাড়ীতে ঢুকছে দেখলেই পায়খানা, কলতলা কি এমনি একটা নিভৃত জায়গায় সরে গিয়ে 'হাড়কিপ্‌টের' মুখদর্শন যাতে না করতে হয় সেই জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

হ্যাঁ, তিনকড়ি সেদিন 'মাছ, মাছ' বলে একটু বেশি কাঁদছিল। শুনে বিরাজমোহনের মনে কষ্ট হল। তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে ব্যাগ তুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে বোনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন, একটু মাছ ডিম খেতে দিবি মাঝে মাঝে। এখন থেকে যদি প্রোটিনের অভাব হয় বাচ্চাগুলোর শরীর ডেভলাপ করবে না। বলে আর অপেক্ষা না করে যেমন এসেছিলেন গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

বিরাজের দেওয়া বড়সড় সেই কারেন্সি নোটখানা নিয়ে বাড়ীতে সেদিন তুমুল ঝড় উঠল।

'মামার টাকা তিনকড়ির যেমন অধিকার আছে আমাদেরও আছে! আমরা মাছ খেতে চাই না। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে টাকাটা ভাগ করে দেয়া হোক। আমরা দু' বোন দু' টাকা দিয়ে ব্লাউজ কিনব।' বড় মেয়ে দুটো হঠাৎ সেদিন মুখ খুলল। বড় ছেলে দুটো বোনদের কথা শুনে গর্জ্জে উঠল; 'সেই ভাল, আমরা দু' ভাই দু' টাকা দিয়ে সিনেমা দেখবো। মাছ খেতে চাই না। ভারি তো লাগে মাছ।'

কিন্তু তিনকড়ি কিছুতেই হাতের মুঠো থেকে নোট আলগা করল না।

ভাইয়ের টাকা। একটু বেশি খুশি হয়ে বৈদ্যনাথের স্ত্রী কনিষ্ঠপুত্র ও নিজের মধ্যে সেটা ভাগাভাগি করে ফেলেছে। আড়াই টাকা দিয়ে তিনকড়ির সার্ট জুতো হবে আর বাকিটা সুলতা তার লক্ষ্মীর কৌটায় তুলে রাখবে। আপদে বিপদে খরচ করা যাবে। কতকাল কৌটায় সে একটা পয়সা রাখতে পারছে না। কিন্তু তিনকড়ি সেসব কথায় কর্ণপাত করছে না। টাকাটা মার হাত থেকে কি করে সে ছিনিয়ে নিয়েছে। আর একটু হলে কাগজের টাকা ছিঁড়ে যেত। কাজেই ভয়ে সুলতাও আর টানাটানি করলে না। আর কেউ এ টাকায় ভাগ বসাক তিনকড়ির মোটেই ইচ্ছা নেই। টাকা হাতে নিয়ে সে 'মাছ মাছ' করে অবিশ্রাম চিৎকার করছে। পায়খানা সেরে বৈদ্যনাথ ঘরে এসে সব দেখে শুনে হতভম্ব। বস্তুত পরমাত্মীয় বিরাজমোহন যে পাঁচটা টাকা দিয়ে তার ঘরে এমন অশান্তির আগুন ছড়িয়ে যাবে বৈদ্যনাথ কল্পনা

কবতে পাবেনি। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদেব চেহাবা দেখে চট কবে বুদ্ধি স্থিব কবে ফেললেন তিনি। 'দবকাব নেই জুতো ব্লাউজ সিনেমা আব লক্ষীর কৌটোব জন্য ওটা ভাগাভাগি কবাব। ঐ দিযে মাছ আনব। সবাই খাবে।' বলে বৈদ্যনাথবাবু তৎক্ষণাৎ গায়ে পাঞ্জাবি চড়ান এবং থলে হাতে কবে কনিষ্ঠপুত্রেব সামনে এসে হাত বাডিযে দেন। 'দাও বাবা আমি বাজাব থেকে মাছ কিনে আনব তোমাব জন্যে—এত বড মাছ।' খুশিতে দুই চোখ গোল হযে গেল তিনকডিব। টাকাটা বাবাব হাতে তুলে দিতে সে আব বিন্দুমাত্র দ্বিধা কবে না। স্ত্রী ফ্যাল ফ্যাল কবে তাকিযে থাকে। বড মেযে দুটো চুপ। ছেলে দুটো বাগে গজ গজ কবে। বস্তুত মাছেব অভাবে এতকাল ওবা খেতে বসে যেমন চেহাবা কবেছে আজ মাছেব নাম শুনে বাড়ীতে বড় মাছ আসছে জেনে তাদেব মুখভাব ঠিক এমন হবে কে বলবে। কিন্তু বৈদ্যনাথ মতেব পবিবর্তন কবেন না। ববং গলা বড কবে বললেন, 'মাছেব টাকা। ওই দিযে শুধু মাছই আসবে। জামা জুতোয খবচ কবা কেন। হাতে টাকা থাকলে পাঁচ টাকাব মাছ খাওযাব মেজাজ আমাদেবও হয়। বিবাজ আব একদিন এসে শুনুক।'

বলতে কি, অনেকটা বাগেব মাথায় বৈদ্যনাথবাবু সেদিন থলে হাতে কবে বাজাবে মাছ কিনতে ছুটলেন। বিবাজমোহন আজ বলা নেই কওয়া নেই পকেট থেকে টাকা বাব ক'বে দিযেছে। তা-ও 'মাছ' খেতে। বৈদ্যনাথ এটা কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পাবেন নি। জামা-কাপড, সন্দেশ বাবড়ি, ফলমূল বা খেলনা কিনে দিও বললেও বৈদ্যনাথবাবুব এত বাগ হ'ত না। মাছ। বৈদ্যনাথবাবুব ঘবে মাছ আসে না। প্রোটিনেব অভাবে তার ছেলেমেযেব স্বাস্থ্য খাবাপ হযে যাচ্ছে। অর্থাৎ সবাসবি বৈদ্যনাথেব ঘবেব হাডিব দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ কবা। 'তুমি ভাল খেতে দিতে পাবছ না সন্তানদেব।' মাছেব নাম কবে পাঁচটা টাকা মুঠ থেকে আলগা কবে দিয়ে কৃপণ বিবাজমোহন আজ বেশ ভালভাবেই বৈদ্যনাথবাবুব পৌরুষকে খোঁচা দিয়ে গেল। 'তা আমিও শক্ত ধাতেব লোক।' বৈদ্যনাথ মনে মনে বলেন, কিছুতেই এই টাকাব জেব আমি ঘবে বাখব না। মামা টাকা দিযেছিল ব্লাউজ গায় দিচ্ছি। মামাব পয়সায় এই চটি, দাদাব সেই পাঁচটাকা থেকে আমি ক'টা পয়সা বাঁচিয়ে লক্ষীর কৌটোয় তুলে বেখেছি ইত্যাদি কোনরকম কথা ঘবে লেগে থাকবে আর 'হাড়কিপটে' লোকটাব চেহারা বৈদ্যনাথবাবুব চোখের সামনে অহবহ

ভাসতে থাকবে বৈদ্যনাথবাবু তা একেবারেই চান না। 'সবটা পয়সা দিয়ে আজ তিন টাকা সেরের রুইয়ের পেট কি চার টাকা সেরের গঙ্গার ইলিশ ঘরে নিয়ে যাব।' তিন বছরের তিনকড়ির মত তিপ্পান্ন-বছরের বৈদ্যনাথবাবুর দাঁত ও জিহ্বা মাছের জন্য শিরশির করছিল। মাছ মাছ। কতকাল মাছ খাওয়া হয় না। যাকে বলে মেছো-মন নিয়ে তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে মানিকতলার মাছের বাজারে ঢুকলেন।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

আশ্চর্য, ভিড় তেমন নেই কিন্তু। একশ পাওয়ারের এক একটা বাল্‌ব জ্বেলে মেছোরা দোকান সাজিয়ে বসে আছে। রুই, কাতলা, ভেটকি, চিতল, চিংড়ি, পার্শে, তপসে। না, এটা মিথ্যা কথা, কলকাতায় মাছের আমদানি নেই, মাছের অভাবে মানুষ শুকনো শাকপাতা চিবোয় ডালের জল খায় আর টি বি বেরিবেরিতে মরে, আজ, এখন, এমন চমৎকার মাছের বাজার দেখে বৈদ্যনাথবাবুর কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না। বরং বলা যায় মাছ খাইয়ে লোকের অভাব। লোকের কি আর অভাব, পয়সা নেই, আসল কথা। বিরাজের দেওয়া পাঁচ টাকার কড়কড়ে নোটখানা ঘড়ির পকেটে আর একবার অনুভব করে বৈদ্যনাথবাবু বাজারের এ-মাথা ও-মাথা একটা লম্বা চক্কর দেন সবাই তা করে। বাজারে ঢুকে আর হুট করে কে আর সামনে যে মাছটা চোখে দেখল কিনে সরে পড়ল। এবং এটা বৈদ্যনাথবাবুরও স্বভাব না। কালে ভদ্রে যখনই তিনি মাছ কিনতে আসেন কমসে-কম পঁচিশটা দোকানে পঁচিশ রকম মাছের দর জিজ্ঞেস করে ওজন যাচাই করে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে গন্ধ শুঁকে তবে মাছটি তিনি থলেতে তোলেন। হয়তো শেষ পর্যন্ত এক-পো কুঁচো চিংড়ি কিনেছেন। কিন্তু আড়াই টাকা সেরের ভেট্‌কি, তিন টাকা সেরের রুই, চার সাড়ে চার টাকা সেরের কই, মাগুর দর করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি কোনদিন। আজ আমদানিটা বেশি। খদ্দেরের ভিড় নেই বললে চলে, এবং পকেটটা বেশ ভারি থাকার দরুণ বৈদ্যনাথবাবু হৃষ্টমনে নিশ্চিন্ত গতিতে ঘুরে ফিরে মাছ দেখতে লাগলেন। মানুষ যেমন পার্কে ঘুরে বেড়ায় এবং সেই পার্কে ফুলের বাগান থাকলে ও ফুল থাকলে একটি ফুলের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন সে শোভা দেখে ও জোরে জোরে শ্বাস টেনে ফুলের গন্ধ অনুভব করতে চেষ্টা করে তেমনি বৈদ্যনাথবাবু এক একটা দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মাছ দেখতে লাগলেন আর গন্ধ নিতে চেষ্টা করলেন। কাটা মাছের

গন্ধ, আস্ত মাছের গায়ের গন্ধ, বরফ চাপা মাছের ঠাণ্ডা আঁশ্‌টে গন্ধ এবং কেবল গন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে না পেরে দু'টো একটাকে আঙুল দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন নাকের কাছে তুললেন।

বলতে কি ভিড় নেই বলে খদ্দেররাও পরস্পরের চেহারা বেশ ভাল দেখতে পাচ্ছিল। এটা বাজারের দস্তুর। পাশে দাঁড়িয়ে যে খদ্দেরটি একটা মাছ দর (দেড় টাকাকে পাঁচসিকে করার চেষ্টায়) করছে যদি আপনার সেই মাছের ওপর লোভ যায় এবং বোঝেন দর কষার প্রতিযোগিতায় আপনি তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না (আপনি আঠারো আনার বেশি উঠতে পারছেন না), আপনি আলগোছে কেটে পড়েন সেখান থেকে।

কিন্তু সেই ধরনের খাইয়ে লোকের চেহারা বৈদ্যনাথবাবুর চোখে পড়ল না। বেশেভূষায় তা না-ই—রোজ মাছের প্রোটিন ফ্যাট্ খেয়ে চেহারার জলুস এনেছে সারা বাজার ঘুরে এমন একটা মুখ তার নজরে পড়ল না। বৈদ্যনাথবাবু এতে খুশি হন।

ইচ্ছা মতন তিনি ঘুরে ঘুবে মাছ দেখেন আর দরদস্তুর করেন।

করতে করতে তিনি গলদার ঝাঁকার কাছে এসে দাঁড়ান।

কিন্তু তেমন টাট্‌কা মনে হয় না।

হাত দিয়ে আব না ছুঁযে বৈদ্যনাথবাবু হাঁটেন! এগিয়ে যান। এমনও সময় সময হয়, যেমন ধরুন, একজন খদ্দের, আপনার যে মাছটা পছন্দ হয়েছে তারও হল খানিকটা দর করে তিনি চুপ করে গেলেন, আপনার দিকে তাকিয়ে নীরবে তিনি লক্ষ্য করছেন আপনি কতটা ওঠেন।

পার্শে মাছের সামনে দাঁড়িয়ে তাই হ'ল। বৈদ্যনাথবাবু আড়াই টাকা শেষ করে এক লাফে দু'টাকা বারো আনায় উঠে যান। দোকানি ঘাড় নেড়ে তিন টাকার এক পাই কম না। একটু নীরবে হেসে পাশের খদ্দেরটি সরে গেল। এমনও মাঝে মাঝে হয, যখন আপনার দর শুনে, পযসার আড়াআড়ি না-পছন্দের বেশকম দেখে পাশের খদ্দের আপনার দিকে একটা উপেক্ষার হাসি হেসে 'বাজে জিনিস এত দর দিয়ে কিনব না' বলে সরে যায়। তখন আপনি মাছ থেকে চোখ তুলে সেই খদ্দেরকে দেখেন। বৈদ্যনাথবাবুও দেখলেন। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এমন তাজা চকচকে পার্শে মাছকে 'বাজে জিনিস' বলে উড়িয়ে দিয়ে সেই খদ্দের এখন কোন্ মাছের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় জানতে এবং সেই দোকানে একবার উঁকি মেরে দেখতে

আপনার আমার মত বৈদ্যনাথবাবুরও বেশ কৌতূহল হল। পার্শে মাছ ছেড়ে তিনি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে যান!

ভেট্‌কি। তাজা! এই মাত্র কাটা হয়েছে। মাখনের মত এত বড় তেলের পিণ্ডটা পেট থেকে টেনে বার করে আলাদা করে রাখা হয়েছে! লেজ ও মাথা সমেত কাঁটাটা একদিকে সরানো। কলাপাতার মাঝখানে নাভি সমেত মাছের পেটটা দুখণ্ড করে সাজিয়ে দোকানি 'খাও খাও বাগবাজারের রসগোল্লা খাও' বলে এমন জোরে চিৎকার করে উঠল যে বাজার শুদ্ধ লোক হকচকিয়ে উঠল। দোকানির গলার স্বর ও কথা শুনে কিন্তু সেই খদ্দেরটি হাসছে। দেখে বৈদ্যনাথবাবুও হাসেন। তারপর হাসি থামিয়ে খদ্দের গম্ভীর হয়ে যেতে বৈদ্যনাথবাবুও গম্ভীর হয়ে যান। আশ্চর্য, বৈদ্যনাথবাবু মাছ থেকে চোখ সরিয়ে খদ্দেরটির মুখের দিকে তাকিয়ে যেন কি একটা কথা শুনতে অপেক্ষা করেন। স্বাভাবিক। এমন চমৎকার পার্শে মাছ যার পছন্দ হয়নি এখন বাজারের সেরা এই ভেট্‌কি—

বৈদ্যনাথবাবুর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হ'ল।

'চৈত্র মাসের ভেট্‌কি মাছে কিছু স্বাদ নেই। বালি বালি লাগে।' বলে ভুরু কুঁচকে ও নাকের ডগায় ছোট্ট একটা মোচড় দিয়ে মেজাজী মানুষটি সরে গেল। বৈদ্যনাথবাবুর বুকটা খালি খালি ঠেকে। বলতে কি এমন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সেই খদ্দের মাছটা সম্পর্কে মন্তব্য করে যায় যে বৈদ্যনাথ-বাবুরও মনে হয় এই জিনিস কেনার অর্থ পয়সাটা জলে ফেলা। শূন্য দৃষ্টিতে তিনি কতক্ষণ মাখনের পিণ্ডের মত চমৎকার তেল ও রক্তমাখা পেট ও নাভি খণ্ডটার দিকে তাকিয়ে থেকে পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার হাঁটেন।

এবং এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বাজারে এসে খদ্দেররা যেমন জিনিসের দাম নিয়ে প্রতিযোগিতা করে তেমনি ভাল জিনিস সেরা বস্তুটি খুঁজে বার করারও একটা গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে তাদের মধ্যে।

এখানে কেবল পয়সাটিই বড় কথা না, মেজাজ রুচি এবং নজরটারও বিচার করা হয়।

বলতে কি বৈদ্যনাথবাবু সামনের একটা লোককে প্রায় ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে মরীয়া হয়ে ছুটলেন। এমন সুন্দর ভেট্‌কিকে যে ধুলোবালি করে দিয়ে গেল সে এখন আবার কোন্ মাছের ওপর চোখ দিয়েছে গিয়ে দেখতে এবং

দরকার হলে স্থায্য মূল্যের চেয়ে আট আনা বেশি দিয়ে তা আগেভাগে কিনে ফেলতে বৈদ্যনাথবাবু পাগল হয়ে উঠলেন। অন্যদিন তিনি এমন করতেন কি না তা বলা যায় না। করেন না। পয়সা কম থাকে। হয়তো মাছ সব্জি ডাল মশলা এবং আটা চিনির লম্বা ফর্দ পকেটে নিয়ে তিনি পাঁচ টাকার বাজার করতে আসেন। এসেছেন। আজ আর তা না। একে শালার দেওয়া টাকা। মায়া কম। তার ওপর সবটাই মাছের তলে খরচ করার কথা। করবেন এই জিদ নিয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, সুতরাং—

ঘড়ির পকেটে টাকাটা আর একবার আঙুল দিয়ে অনুভব ক'রে বৈদ্যনাথবাবু তপ্‌সে মাছের ডালা ঘেঁষে দাঁড়ান। খুব বেশি না, সের দেড়সের মাছ, কিন্তু একেবারে তাজা। আগুনের মত তপসের গায়ের রং, এই মাত্র জাল দিয়ে নদী থেকে তুলে আনা হয়েছে, হুঁ ডায়মণ্ডহারবারের লোনা জলের মাছ, জল শুকিয়ে গিয়ে নুনের ছিটা গায়ে লেগে আছে। দাম ? চার টাকা এক সের। 'নিন বাবু নিন বছরের নতুন ফল !' আম জামের মত, মাছও একটা ফল বটে। বৈদ্যনাথবাবু ক্ষীণ হাসলেন ! চার টাকা সেরের মাছ খাবার মত লোক নেই। তাই দোকানের সামনে বৈদ্যনাথবাবু ও সেই মানুষটা ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু এই মাছও কি—অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বৈদ্যনাথবাবু মেজাজী খদ্দেরের চেহারা দেখেন। না, তপসেও পছন্দ হল না। ছোট্ট লাল ব্যাগের মুখ খুলতে গিয়ে আবার তৎক্ষণাৎ তা বন্ধ করে মানুষটা সেখান থেকে সরে গেল। বৈদ্যনাথবাবু হতাশ হয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়লেন। কিন্তু হতাশ হলেও উদ্যম হারালেন না ! আবার হাঁটেন।

কি মাছ ? গঙ্গার ইলিশ। দেখছেন না বরফে দেওয়া হয় নি। পায়রার বুকের মত তখনো গরম মাছের গা ! আঁইশ চুইয়ে ভেতর থেকে তেল বেরোচ্ছে। হুঁ, পাঁচ টাকা এক সেরের দাম। ও-বেলা সাড়ে পাঁচ বিকিয়েছে। 'খাও খাও বাগবাজারের রসগোল্লা নর্দমায় ঢেলে ইলিশ খাও—'

বৈদ্যনাথবাবুর জিহ্বায় জল এল। এবং আসতে না আসতে তা শুকিয়েও গেল।

'বাজে জায়গার মাছ। গঙ্গার মাছ না হাতি। গঙ্গার ইলিশের মাথা এমন মোটা হয় ?'

তাই। আর একবারও ইলিশের দিকে না তাকিয়ে বৈদ্যনাথবাবু হাঁটেন। এগোন। কি মাছ ? কৈ। জ্যান্ত। যশোরে কৈ না যে মাথাটা বড়

শরীরটা শুকনো। মাতলার মাছ। হাতের তেলোর মত চওড়া পেট,—আ-হা কি মাছ! রাজভোগ!'

এবার বৈদ্যনাথ আগে মেজাজ দেখান।

'রাজভোগ না ঘোড়ার ডিম্ব।' চেহারা বিকৃত ক'রে তিনি লাল-ব্যাগ-হাতে পাশের মানুষটিকে দেখেন। 'নৌকোয় একমাস জিইয়ে রেখে এইবেলা তুলে আনা হয়েছে বাজারে। টেষ্ট নেই। ডিম ভর্তি, তা ছাড়া,—চোতবোশেখের কৈ হ'ল জার্ম কেরিয়ার। কলেরা পক্স ছড়ায়, কি বলেন?'

শুনে আর একজন মাথা নাড়ল। এবং দাম জিজ্ঞেস না করে' দু'জন একসঙ্গে দোকান পরিত্যাগ করলেন।

বোয়াল? রাবিশ। চিতোল? বরফ খেয়ে খেয়ে ঢ্যাব্‌সা হয়ে গেছে। ওটা কি? আড়। ধেৎ। টাট্‌কা হলে চকচক করত—নাঃ হ'ল না।

ছোট ব্যাগ দুলিয়ে আগে আগে তিনি হাঁটেন। বৈদ্যনাথ পিছনে। ইলেক্‌ট্রিক আলোয় সারা বাজার চিকচিক করছে। কলাপাতার বিছানায় মাছেরা চুপচাপ শুয়ে। কাটা আস্ত। বরফ দেওয়া বরফ না-দেওয়া। যেন খদ্দেরের অভাব দেখে দোকানিরা এইবেলা ঝিমোচ্ছে। আর মাছ দেখতে মাছ পছন্দ করতে হেঁটে হেঁটে বৈদ্যনাথবাবুরা ঘামছেন।

এবং শেষ পর্যন্ত কিছুই পছন্দ হয না।

বৈদ্যনাথবাবু প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু কি ঘটছে নিজে তিনি কি করছেন যখন চোখে দেখতে পেলেন আর অবিশ্বাস করেন কি করে।

তাই। এত মাছ পিছনে ফেলে শেষটায় কিনা তিনি আনাজ তরকারির বাজারে ঢোকেন।

'তা মন্দ কি।' বৈদ্যনাথবাবুর মন বলল, 'তিনকড়ি মাছ খেতে চাইছে, মেয়ে দু'টোর ইচ্ছা ব্লাউজ, ছেলেদের শখ সিনেমার, গিন্নির চিন্তা লক্ষ্মীর কৌটো,—আমার, আমারও একটা নিজস্ব চিন্তা আছে, ইচ্ছা, রুচি।'

নতুন জিনিস। বেশ কচি। সবে বেরিয়েছে। যেন এইমাত্র চাষীরা ক্ষেত থেকে তুলে এনে পাইকারকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

'হুঁ', বৈদ্যনাথবাবু মনে মনে ঠিক করলেন, 'আমার যখন সাধ হয়েছে পটল খেতে, পাঁচটাকার পটল কিনে নিয়ে যাব আজ। ভাজা খাব ডালনা খাব দোরমা খাব। এবেলা খাব, কাল দুপুরে, রাত্রে। যদি কিছু থেকে

যায় পরশু নাগাদ ঐ চালাব। এখন দাম চড়া। পাঁচ টাকায় আর ক'সের উঠবে।' মাছের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বিরাজের টাকাটা স্রেফ পটলের তলে খরচ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বৈদ্যনাথবাবু ঝাঁকার ওপর ঝুঁকে পড়েন।

কিন্তু তখনি চোখ তুলে দেখেন যাকে অনুসরণ ক'রে তিনি এই অবধি এসেছেন তার পটল পছন্দ হয়নি।

হাতের মুঠ থেকে কচি পটলটা ছেড়ে দিয়ে বৈদ্যনাথ সোজা হয়ে দাঁড়ান। দাম জিজ্ঞেস করেন না।

'জলে ভিজিয়ে চকচক ক'রে রাখা। ভিতরটা শুকনো।'

তা হবে। তাই হবে। শব্দ না ক'রে বৈদ্যনাথবাবু হাঁটেন।

বারুইপুবের বেগুন। মাখনের মত নরম।

বারুইপুর না ছাই। ধাপার পচা মাটির বেগুন। মানিকতলায় এসে বারুইপুরের কুলীন সেজেছে।

বৈদ্যনাথবাবু এই এত বড পরিপুষ্ট সবুজ কাঁচকলার ছড়ার ওপর শেষবারের মত চোখ রেখেছিলেন। তারপর আনাজের দোকান পার হয়ে তিনি পেঁয়াজ রসুনের দোকানের সামনে চলে যান। এত পেঁয়াজ। চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন। 'সারা কলকাতার লোক ছ'মাস খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তা না পারুক।' বৈদ্যনাথবাবু মনে মনে ঠিক করলেন, 'বিরাজের টাকাটা সবাই এভাবে সেভাবে খরচ করতে চাইছে। আমি একটি পাই না বাঁচিয়ে পাঁচ টাকার পেঁয়াজ কিনে আজ ঘরে ফিরব। সারা মাস ওই চলবে। পেঁয়াজ ভাজা পেঁয়াজ সেদ্ধ। আলুর মধ্যে কিছু ছেড়ে দিয়ে উত্তম ডালনা হয়। বরফ-চাপা মাছের চেয়ে আলু-পেঁয়াজের ডালনা পুষ্টিকর তো বটেই খেতেও ভাল লাগে।

রংদার বড় বড় পাটনাই পেঁয়াজ দেখে বৈদ্যনাথবাবুর জিহ্বায় জল এল।

কিন্তু ভুল করলেন তিনি। অবশ্য ভুলটা ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জিহ্বাও শুকিয়ে তেজপাতার মত ঝরঝরে হয়ে গেল।

তা তো বটেই। পেঁয়াজ দেখলে একজনের জিহ্বা সজল হয় আর একজন এই সুন্দর দ্রব্যটার দিকে তাকানই না। এমন চমৎকার পার্শে কৈ এমন কচি পটল, বেগুন যিনি হেলায় ফেলে এসেছেন তাঁর মেজাজ পেঁয়াজ বরদাস্ত করবে এটা মনে করা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে বৈদ্যনাথবাবুর। চিন্তা করলেন তিনি এবং তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

পেঁয়াজের দোকানগুলি পিছনে ফেলে তিনি তাড়াতাড়ি তালপাতার পাখার দোকানের দিকে অগ্রসর হন।

এবার বৈদ্যনাথবাবু একটু নিজের মনে হাসলেন।

যেন বিরাজমোহনের টাকাটা দিয়ে তিনি মনে মনে শাটলকক্ ছোঁড়াছুঁড়ি খেলছেন। কখনো ঢালছেন মাছে কখনো কাঁচকলায় পেঁয়াজে। এইবেলা কি তিনি তালপাতার পাখা কিনে সেটা সাবাড় করতে চাইছেন? পাঁচটাকায় ক'ডজন পাখা মিলবে? তা পাখা কিনে যেমন তিনি আপদ বিদায় করতে পারেন তেমনি ওধারের দোকান থেকে পাথরচুন কিনেও তা শেষ করতে পারেন। দোষের নেই।

কিন্তু নির্বিঘ্নে তিনি সে-সব দোকান পার হন। অর্থাৎ নিতান্ত অকাজের জিনিসে টাকাটা খরচ হবে ভগবান চাইছিলেন না দেখে বৈদ্যনাথবাবু মনে মনে বিরাজের ওপর তুষ্ট হন। কেবল বড়মানুষী দেখানো না, আসলে ভালবেসে ভাগ্নে-ভাগ্নী মাছ খাবে মন নিয়ে টাকাটা সে বোনের হাতে তুলে দিয়ে গেছে।

ঈশ্বর এবং সেই সঙ্গে সেই সুন্দর রুচির মানুষটিকে, যার পিছনে হেঁটে বৈদ্যনাথবাবু এই অবধি এসেছেন, মনে মনে ধন্যবাদ জানান এবং হাঁটেন। বিরাজের টাকাটা তাঁর পকেটে থেকে মহত্তর কোনো কাজে ব্যয়িত হবার সম্ভাবনায় যেমন উশখুশ করছিল তেমনি বৈদ্যিনাথবাবুর বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করছিল।

হাঁ, সেই ছোট্ট লাল ব্যাগের ওপর চোখ রেখে এত সব দোকান ঘুরে কিছুই না কিনে বাজার থেকে বেরিয়ে শেষটায় তিনি যুবতীর সঙ্গে রাস্তায় নামলেন।

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে তখন।

বৈদ্যনাথবাবু ভেবেছিলেন ও ট্রামবাস ধরতে যাবে, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে রাস্তা ক্রশ, ক'রে উল্টোদিকের ফুটপাথে উঠে সাজানো বড় মনোহারী দোকানটায় গিয়ে ঢুকল। চোখমুখ বুজে তিপ্পান্ন বছরের ক্লান্ত পা দুটোকে হঠাৎ অতিমাত্রায় সজাগ করে বৈদ্যনাথবাবুও ছুটে রাস্তা পার হয়ে সরাসরি সেই দোকানে গিয়ে ঢোকেন।

যুবতী ততক্ষণে একটিন পাউডার চেয়েছে, একটা ছোট মাখনের টিন ও একটা পাউরুটি। চাওয়ামাত্র চটপটে হাতে দোকানী সব এনে সামনে

কাচের টেবিলের ওপর রাখল প্রায় বৈদ্যনাথবাবুর হাত ঠেকিয়ে। কেননা বৈদ্যনাথবাবু তরুণীর শরীর ছুঁই ছুঁই ক'রে দাঁড়িয়ে কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে আছেন।

বৈদ্যনাথবাবু একটু অসুবিধায় পড়লেন। পাউডার মাখনের ব্যবহার তাঁর সংসারে নেই। জিনিসগুলোর দাম জানেন না। কাজেই এগুলো ভাল 'কোয়ালিটির' কিনা এবং কিনলে হার হবে কি জিত হবে ইত্যাদি কোনরকম মন্তব্য হঠাৎ করতে না পেরে তিনি ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন। দেখলেন কোনরকম দরদস্তুর না করে যুবতী সব তুলে একটা রুমালে বাঁধল। রক্তের মত লাল রং রুমালটার।

একটু বেশি সময় বৈদ্যনাথবাবু পাকা চোখ মেলে ওর কচি আঙুল ঘুরিয়ে রুমালে গিঁঠ দেওয়া দেখছিলেন বলে যেন মেয়েটি আরো বেশি বিরক্ত হল। চোখ তুলে রীতিমত রেগে উঠে বলল, 'হা ক'রে তাকিয়ে দেখছ কি। না কি এখনো বলতে চাইছ সংসার তোমার না আমার। পাউডার আমার দরকার নেই, তোমার ছেলেমেয়ের কাল সকালে উঠে চা-রুটি-মাখন কিছুই খেতে হবে না। কেবল তো দোকান থেকে দোকানে ঘুরছ আর সবটাতেই না—না করছ শুনছি।'

'না কি বাড়ীর ঝগড়া বাজারে টেনে আনছ।' একটু থেমে সবে মেয়েটি আবার বলল 'না কি এখন বাজারে এসে ঘোষণা করতে চাইছ আমি তোমার বিয়ে করা স্ত্রী না। আমার নিজের ও তোমার ছেলেমেয়ের জন্যে এক পাইও খরচ করতে তুমি ইচ্ছুক নও। সব সুখ শেষ হয়েছে।'

বৈদ্যনাথ ভূত দেখে এতটা চমকে উঠতেন না। যুবতীর কথা শুনে ও ওর চোখ দেখে তাঁর অবস্থা যেমন হয়।

'বেশ, থাক তুমি দাঁড়িয়ে এখানে ভূতের মতন,—আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আপনি এর কাছ থেকে দামটা রেখে দিন। আমি চললাম, বুঝলে আমার ঘরসংসার আছে বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হবে।'

রুমালে বাঁধা জিনিসগুলি ও সেই লাল ছোট্ট ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে দোকানের চৌকাঠ পার হয়ে তরুণী রাস্তায় নেমে গেল।

'কই দিন মশাই, চার টাকা তের আনা। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বুঝি। তাই এত তেজী এমন কড়া। চটপট দাম মিটিয়ে বাড়ী ফিরে গিয়ে পায়ে ধরুন আর কি।'

ফোকলা দাঁত বের করে দোকানের আর এক বুড়ো কর্মচারী ক্যাশমেমোটা বৈদ্যনাথবাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে চোখ টিপল।

ঘাম ও বৃষ্টিভেজা শীর্ণ আঙুল দু'টো ঘড়ির পকেট গলিয়ে বিরাজের দেওয়া পাঁচটাকার নোটখানা তাড়াতাড়ি টেনে বার ক'রে লোকটির হাতে দিয়ে বৈদ্যনাথবাবু নিঃশব্দে রাস্তায় নামলেন। মুষলধারে বৃষ্টি। কিন্তু রাস্তায় নেমে তাঁর মনে হয় ফেরত তিন আনা দোকানীর কাছ থেকে চেয়ে আনা হয়নি। মনে হওয়া সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে ভাবেন এখন আবার ওটা চাইতে যাওয়া সমীচীন হবে কি। বাজারের চোখে স্বাভাবিক! ভেবে বৈদ্যনাথবাবু ফাঁপরে পড়েন।

বাড়িতে বড়রা তো বটেই শিশু তিনকড়ি পর্যন্ত বাবার পকেট মারা গেছে শুনে মাছের আব্দার শিকায় তুলে রাখল।

কিন্তু অফিসে সহকর্মী অন্নদাবাবুর কাছে কি ক'রে বৈদ্যনাথ গল্পটি বলে ফেললেন। শুনে অন্নদাবাবু ঠোঁট টিপে হাসলেন। তারপর বৈদ্যনাথবাবুর পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। 'গেছে গেছে পাঁচ টাকার ওপর দিয়ে গেছে। মশাই আফশোষ করবেন না। বোনার কোম্পানীর কামাখ্যাবাবু কাল একশ টাকা নিউমার্কেটে গিয়ে খুইয়ে এসেছে। চশমাপরা তো? লম্বা মতন। ফর্সা, ধবধবে গায়ের রং? বুঝতে পেরেছি। খুব বুঝতে পেরেছি।'

'কামাখ্যাবাবু বুঝি নিউমার্কেটে দেখা পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ, ও তো ওখানেই থাকে ওখানেই ঘুর ঘুর করে। মাঝে মাঝে মানিকতলায় কলেজ স্ট্রীটে আসে। বেশ ভাল ইন্‌কাম। তা আপনি বাজারে গিয়েছিলেন কেন?' অন্নদাবাবু ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেন।

'ছেলের জন্যে মাছ কিনতে।' বৈদ্যনাথ কিছুই গোপন করলেন না।

'কামাখ্যা গিয়েছিলেন ওঁর ছোট ছেলের অন্নপ্রাশনের ফুল-মিষ্টি কিনতে। তা ঐ একই কথা। আপনার মত তিনিও—' বিড়ি ধরবার জন্য অন্নদাবাবু থামেন। বিড়ি ধরানো শেষ ক'রে বললেন, 'তা আপনার কিছু দোষ নেই মশাই। কামাখ্যাবাবুর মুখে তো শুনলাম। বেশ সেয়ানা মেয়ে। তার ওপর রূপ্‌ নাকি একেবারে খাই খাই করছে। কতক্ষণ বাজারে ঘুরেছিলেন? ঘণ্টাখানেক?'

বৈদ্যনাথ নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন।

'মাছ কিনতে গেছলেন তো সেয়ানা রুই মাছেই আপনার টাকা নিয়েছে। আফশোষ করা কেন?' অন্নদা টেনে টেনে হাসেন।

'তা বটে।' যেন কি মনে করতে ক্ষণকাল চোখ বুজে থেকে বৈদ্যনাথ পরে হাসলেন। 'সেয়ানা মাছই বলা যায়। বেশ পাকা ঝানু। অবশ্য দেখতে যতটা কম বয়সের কচিমতন মনে হয় আসলে যেন ততটা না। আমার তো মনে হ'ল। ততটা না। কামাখ্যাবাবু আপনাকে কি বলেছে সেকথা? একটু যেন মেক্-আপ আছে।'

'ওটি না থাকলে ইস্কুলে পড়ুয়া ছেলে-ছোকরা থেকে শুরু ক'রে আপনাদের মত বুড়োধাড়িদেরও টানবে কি ক'রে মশাই। আপনি ওর বৌ-সাজ দেখে ক্ষেপেছিলেন। কামাখ্যাবাবু অই বয়সে ওর পিছু নিয়েছিলেন স্রেফ কলেজ-গার্ল মনে ক'রে। দেখুন কী ক্ষমতা রাখে কতটা কন্ট্রোল নিজের চেহারার ওপর শরীরের ওপর!'

বৈদ্যনাথ একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন।

ঝড় উঠল সেদিন। সকালবেলা। বৈশাখী ঝড়। আবার কালবৈশাখীও নয় কেননা ধূমল আগুনে রঙের মেঘ ছিল না আকাশে কোথাও, কি এখনি অন্ধকার নামবে তার এতটুকু আভাস!

পরিষ্কার মাজাঘষা সোনালি রোদে মোড়া ঝকঝকে একটা দিন, দিনের আরম্ভ। তাই। একটু আগে চা খাওয়া সাঙ্গ হয়েছে ঘরে ঘরে, কাগজ পড়া প্রায় হয়ে এল, বাংলায় খবর বলা শেষ করে অল ইণ্ডিয়া রেডিও গান ধরেছে। এমন সময়। এমন সুন্দর ক্ষণটিতে সুকিয়া ষ্ট্রীটের দু'টো ফ্ল্যাটের কমন বারান্দায় ছোটখাটো ঝড় উঠল।

হ্যাঁ, ডালিয়ার ঝাড়ের নিচে ঝড়। নীলিমার টবে এতবড় দুটো ডালিয়া ফুটেছে। মনোহর ফুল দুটোকে অবাক কোনো কেক্ মনে করে হেমেন্দ্র-বিজয়ের কুকুরটা ছুটে কামড়াতে গেল কি গন্ধ শুঁকতে গেল বোঝা গেল না। তবে কুকুরকে রুখতে পাশের ফ্ল্যাট থেকে আর কেউ বেরবার আগে ছুটে এল ওদের বেড়াল। কালো রং কিন্তু কালোর চেয়ে গায়ে লাল ফুটকির সংখ্যা বেশি আর চোখে শাদা কি নীলের চেয়ে পিঙ্গলের ভাব। যেন হিংসায় সারাক্ষণই জ্বলছে। যেন নীলিমার বেড়ালের অদ্ভুত চেহারা দেখে হেমেন্দ্র-বিজয়ের কুকুর ক্ষেপে গেল বেশি। ফুল ছেড়ে মার্জারীকে তাড়া করল। এইটুকুন টেরিয়ারের কী বিকট গর্জন!

'এই রাস্কেল। চুপ।' বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরে করিডোর থমথমিয়ে উঠল।

'এই হিংসুক ছোটলোক!' তীক্ষ্ণ অস্থির চিৎকার আচমকা বর্শা ফলকের মত এসে বেড়ালটাকে বিদ্ধ করল। 'তোমার ফুল খেয়ে ফেলছে না ও।'

তথাপি হেমেন্দ্র টেনে কুকুরটাকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল! নীলিমা শান্ত গলায় বলল, 'দেখছে দেখুক, ফুল ও ভালবাসে।'

'না ভালবাসে কি।' চোখ তুলে হেমেন্দ্র হাসল। 'সবুজ নরম ডাঁটাগুলো এমনি কামড়ে শেষ করে দেবে! স্কাউণ্ড্রেলটাকে দিয়ে কিস্সু বিশ্বাস নেই।'

কুকুর ধরতে ছুটে এসে হেমেন্দ্র ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল। বেড়ালকে এতবড় একটা ধমক লাগিয়ে নীলিমার হৃৎপিণ্ড দুব্ দুব্ করছে।

হেমেন্দ্র দাড়ি কামাচ্ছিল, গালে সাবান। নীলিমা রান্না করছিল। চম্পক আঙুলে হলুদ রং।

বাঁ হাতে স্খলিত আঁচল খোঁপায় ন্যস্ত করে তেমনি ঠাণ্ডা গলায় নীলিমা বলল, 'ছেড়ে দিন আর কিছু করবে না। আয় ইদিকে।' ছোট্ট থুতনি আন্দোলিত ক'রে ও হেমেন্দ্রর টেরিয়ারকে ডাকল।

হেমেন্দ্র হাতের চেন্ আলগা করতে কুকুর ছুটে গিয়ে নীলিমার কোলে উঠল।

'ইদিকে এসো।' হেমেন্দ্রও আদুরে গলায় নীলিমার বেড়ালকে ডাকল! হিংসুটে মার্জারী লজ্জিত ম্রিয়মান হয়ে দেয়াল ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সরে গিয়ে হেমেন্দ্রর পায়ের চটি চাটতে লাগল।

হেমেন্দ্র পরিপূর্ণ চোখে নীলিমাকে দেখছিল।

নীলিমা একদৃষ্টে হেমেন্দ্রকে দেখে। খালি গা। স্ফীত বক্ষ লোমশ। চুল উস্কুখুস্কু। পরনে কালোর ওপর শাদা ষ্ট্রাইপের বার্মিজ লুঙ্গি।

নীলিমার কৃষ্ণচূড়া রং ব্লাউস। সবুজ পাড় সাধারণ খয়েরী সুতির শাড়ি। সাপের মতন পেঁচানো একটা চুল ঘামের আঠায় কপালে আটকে গেছে নড়ছে না। না, দু'জনে দু'জনকে এমনি বহুবার দেখেছে। কাটা কাটা ভাবে। বিক্ষিপ্ত ইতস্তত। উঠতে নামতে। কি ডাকপিওন এল চিঠি নিয়ে। স্বামী এল না। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে পিওনের হাত থেকে ডাক তুলে নিয়ে গেল। হয়ত হেমেন্দ্র সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে তখন কি নিচে নামবে বলে দরজা খুলে করিডরে পা বাড়িয়েছে আর দেখা হতে না হতে নীলিমাও ভিতরে অদৃশ্য হল।

পাশাপাশি ফ্ল্যাট।

আলাপ করার পরিচিত হবার সুযোগ যে না আছে তা নয়। কিন্তু যতবার ইচ্ছা হয়েছে ওই মহলের কর্তা অর্থাৎ নীলিমার স্বামীর চেহারাটি মনে পড়ে হেমেন্দ্রের সব উৎসাহ নিভে গেছে। যেন ভদ্রলোক সর্বদাই কি নিয়ে বিরক্ত। অপ্রসন্ন ভুরু কপাল। আলাপ করলে তিনি মোটেই খুশি হবেন না ধরে নিয়ে হেমেন্দ্র দূরে থেকেছে। বছর ঘুরতে চলল দু'টি পরিবার পাশা-পাশি আছে যদিও।

তেমনি নীলিমা।

পাশের ফ্ল্যাটের মানুষদের কথা ভাবতেই সকলের আগে ভদ্রমহিলা অর্থাৎ

হেমেন্দ্রবিজয়ের স্ত্রীর চেহারা মনে পড়ে তার। যেন মহিলা সারাক্ষণ কি নিয়ে চটে আছেন। ধোবা সময় মত কাপড় দিল না, চাকর বাজার থেকে একটা অচল দু'আনি এনেছে, ভাত কম ফুটল, জলের গ্লাসে কিসের দাগ ইত্যাদির যে-কোন একটা নিয়ে তিনি দিনরাত বাড়ি মাথায় তুলছেন। চিন্তা করে নীলিমা আর ওদিকে ঘেঁষেনি।

আজ সময় বুঝে দু'তরফের কুকুর ও বেড়াল ছুটে এল ডালিয়ার টবের গোড়ায় ঝগড়া করতে। তাই এরা দু'জন কতক্ষণ মুখোমুখি দাঁড়াতে পারল কথা বলল।

'কোথায় বেরিয়েছেন তিনি ছুটির সকালে ?' হেমেন্দ্র প্রশ্ন করল।

'একটা কালচারেল ফাংশনে নেমন্তন্ন রাখতে গেছেন।'

'আপনি গেলেন না ?'

'আমায় নেমন্তন্ন করেনি।' আধবোজা চোখে নীলিমা সুন্দর হাসল। একটু পর আস্তে আস্তে বলল, 'উনি বাড়ি নেই মনে হচ্ছে ?'

হেমেন্দ্র মাথা নাড়ল।

'সেইজন্যেই বাড়ি কিছুক্ষণের মত ঠাণ্ডা।' গালের শুকনো সাবান হেমেন্দ্র নোখ দিয়ে খুঁটে ফেলল। 'ওর কে এক বোনঝি হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে এসেছে, দেখতে গেছে।'

'আপনি গেলেন না ?' নীলিমা প্রশ্ন করল না। হেমেন্দ্রর টেরিয়ার কোলে উঠে আদর পেয়ে এখন দুষ্টুমি আরম্ভ করেছে। নীলিমা তাড়াতাড়ি কুকুরটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে মাটিতে।

'ভীষণ বদমায়েস। ও কি আদরের মানুষ।' চাপা মোটা গোলায় হেমেন্দ্র হাসল। 'আপনি ওকে আদর করছেন, আমি সারাদিন হারামজাদাকে কানমলার ওপর রাখি।'

নীলিমা কাপড়ের ভাঁজ ঠিক করছিল। হাসল।

এদিকে হেমেন্দ্রকেও একটু সরে দাঁড়াতে হয়। আহ্লাদ পেয়ে পা চাটা শেষ ক'রে ওদের বেড়াল তার লুঙ্গি চাটতে শুরু করেছে এখন।

'যা যা, কী তোর চেহারা!' হেমেন্দ্র বিরক্ত—লক্ষ্য ক'রে নীলিমা তাড়াতাড়ি পা দিয়ে বেড়ালটাকে দূরে ঠেলে দিতে বেড়াল এবার হেমেন্দ্রের কুকুরের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'হ্যাঁ, এই বেলা ঠিক হয়েছে। মিলেমিশে দু'জনে খেলা কর, আমাদের

একটু কথা বলতে দে।' চাপা মোটা গলায় হেসে হেমেন্দ্র নীলিমার চোখে চোখ রাখল। 'কটা বাজে এখন ?'

'সাড়ে আটটা। তার বেশি হবে কি। হাসপাতাল থেকে ফিরতে তাঁর দেরি হবে নিশ্চয় ?'

'না সে জন্যে বলছি না!' হেমেন্দ্র ব্যস্ত হয়ে মাথা নাড়ল। 'ছুটির দিন বাথরুমে জল দিতে চাকরটা বড্ড দেরি করে ফেলে। অথচ রোজ দেখছে ব্যাটা ছুটি অছুটি নেই সব দিনই আমি ন'টার মধ্যে স্নান সারি।'

'অ—' অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে নীলিমা চুপ করল।

হেমেন্দ্রও হঠাৎ আর কথা খুঁজে পেল না যেন।

না কি আর দু'জন বাড়ি নেই, প্রথম আলাপেই এর বেশি কিছু বলা বা জিজ্ঞেস করা উচিত হবে না সংশয় জাগল দু'জনের মনে ?

হেমেন্দ্র আড়ষ্টতা জয় করল।

'প্যাসেজ পার হবার সময় আমি আপনার গলার আওয়াজ একদিনও শুনতে পাই না কিন্তু।'

নীলিমা প্রায় শব্দ না ক'রে হাসল।

'যতক্ষণ বাড়িতে আছেন উনি অনর্গল বকছেন তাই আমি আর কথা বলি না।'

আমারও সেই অবস্থা।' হেমেন্দ্র গলার একটা শব্দ করল। 'যতক্ষণ ঘরে আছে এটা ওটা নিয়ে ওর চিৎকার লেগেই আছে। কাজেই আমি চুপ থাকি।'

নীলিমা আড়চোখে তার টবের সুন্দর ডালিয়া দু'টোকে দেখল। আলতো বাতাসে একটু একটু কাঁপছে।

'আপনার স্নান হয়নি ?'

'না।'

'উনি এলে করবেন ?'

'তার কিছু ঠিক নেই।' এবার আর অধরোষ্ঠ নয় দুই চোখ ও ভুরুর মধ্যে নীরব হাসি ধরে রেখে নীলিমা বলল, 'আগে বা পরে এক সময় করলেই হ'ল।'

কথা না কয়ে হেমেন্দ্র একটা ঢোক গিলল। নীলিমার চোখ বা ভুরুর ওপর তার স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি। হেমেন্দ্র এখনি একটা কিছু বলবে। কিন্তু

বলতে দেরি হচ্ছে দেখেই কি নীলিমা তাড়াতাড়ি চোখ নামাল। হেমেন্দ্র আর চুপ থাকল না। 'কাল রাত্রে কি নিয়ে যেন তিনি খুব খিটমিটি করছিলেন শুনছিলাম।'

নীলিমা মাথা নাড়ল।

'কদিন ধরে দাঁতের মাড়ি ফুলে কষ্ট পাচ্ছেন। গরম জলের দরকার পড়ল। হিটারটা খারাপ হয়ে আছে কয়লাও ফুরিয়েছিল। জল না পেয়ে রাত একটা পর্যন্ত চেঁচামেচি করলেন।'

'অথচ দাঁতের ব্যথা নিয়ে আজ কালচারেল ফাংশনে গেছেন', হেমেন্দ্র একটু অবাক হবার সুরে বলল। নীলিমা এ সম্পর্কে আর কিছু বলল না যদিও। কিন্তু চুপ থাকতে হল না তাকে। এই লাইনেই আলাপটাকে সে অব্যাহত রাখতে পারল।

'সকালে বেরবার আগে উনি খুব রাগারাগি করছিলেন শুনলাম যেন।'

'সকাল দুপুর সন্ধ্যা, কখন তিনি রাগারাগি ছাড়া আছেন। স্নান খাওয়া পরা ঘুম বাইরে বেরোনো সব কিছুতেই তার রাগ।' হেমেন্দ্র নাকের একটা শব্দ করল। 'বোনঝিকে দেখতে যাচ্ছে। রিক্সা ডাকতে চাকর আধ মিনিট দেরি করেছিল তাই। উঃ টিকতে পারছিলাম কি আমি ঘরে! বেরিয়েছে, এখন মনে হচ্ছে ঘর আমার স্বর্গ!'

কণ্ঠে সুন্দর ধ্বনি তুলে নীলিমা হাসল!

'না তা কেন হবে।' স্ত্রীর ওপর হেমেন্দ্র এতটা বিরক্ত যেন নীলিমা বিশ্বাস করতে চাইল না। নীলিমা হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আপনার কুকুরটাকে কিন্তু এখানে দেখছি না।'

'কোথায় গেল?' হেমেন্দ্র ঘড়ি ফেরাল। 'আপনার হিংসুটে বেড়ালটাও যে নেই, ঘরে গেছে কি?'

'কি জানি, দেখছি।' নীলিমা নিজের ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এমন সময় দেখা গেল সেই ঘরের পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসছে হেমেন্দ্রর টেরিয়ার। মুখে একটা পাঁউরুটি।

'দেখুন দেখুন রাস্কেলের কাণ্ড' হেমেন্দ্র গর্জন করে উঠল।

'আহা করলি কি!' কুকুরের কাণ্ড দেখে নীলিমা মৃদু আর্তনাদ করে উঠলেও সেই মুহূর্তে আবার হেসে উঠবে ধারণা ছিল হেমেন্দ্রর। কিন্তু এবার

তা হল না। অসহায় চোখে হেমেন্দ্রর দিকে তাকাল নীলিমা। 'আজ উনি এসে এমন ভীষণ চেঁচামেচি আরম্ভ করবেন—'

হেমেন্দ্র বুঝতে পারল।

'তাই বলুন, তাঁর রুটি। ছি ছি ছি!'

'দাঁতের জন্য ভাত চিবোতে পারেন না, দু'বেলা দুধ পাঁউরুটি—'

'বুঝেছি বুঝেছি, আর আমায় বলতে হবে না।' হেমেন্দ্র কেঁপে উঠল, তার ধৈর্য্যের বাঁধ টুটল, করিডর কাঁপানো রণহুঙ্কার ছেড়ে ছুটে গেল টেরিয়ারকে খুন করতে।

'আহা আপনি করেন কি, পাগল হয়েছেন।' নীলিমা হেমেন্দ্রের হাত চেপে ধরল। 'সামান্য একটা রুটির জন্যে—ও কিছু বোঝে?'

'বাষ্টার্ড লোফার চোর ছোটলোক!'

বাধা পেয়ে হেমেন্দ্র কুকুরকে মারল না যদিও, দাঁতে দাঁত ঘষে ইংরেজী বাংলা গালিগুলো এক নিশ্বাসে ঝাড়তে লাগল।

'আর একটা পাউরুটি এখুনি আমি আনিয়ে রাখব। তাতে হয়েছে কি। রুটির অভাব আছে কিছু। খাক ও এটা।' নীলিমা অনুনয়ের সুরে বলল।

'খাবার কথা হচ্ছে না ওর স্বভাবটা দেখছেন তো!'

'বোঝে কি? বোঝে না।' সুশ্রী দন্তরাজি বিকশিত করে নীলিমা হাসল। 'অবশ্য এই রুটির কথা আমি তাঁর কানে তুলছি না।' কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নীলিমার মুখের হাসি নিভল। হেমেন্দ্রর ঘরের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল ও।

'এই সেরেছে, দেখুন মুখপুড়ির কাণ্ড।'

হেমেন্দ্র ঘাড় ফেরায়। নীলিমার বেড়াল লাল বর্ডারের শাদা ধবধবে একটা তোয়ালে মুখে করে তার ঘর থেকে বেরোচ্ছে।

'এই ছাড়্, রাখ্ ওটা ওখানে পেত্নী কোথাকার।'

চিৎকার করে নীলিমা ছুটে যাচ্ছিল। হেমেন্দ্র বাধা দিল। 'আপনি কি পাগল হয়েছেন। খেলুক না ওটা নিয়ে ও। কতক্ষণ খেলবে? পরে ধুয়ে দিলেই চলবে।'

লজ্জিত নীলিমা প্রতিবেশীর চোখের দিকে তাকাল।

'কার ওটা, আপনার?'

হেমেন্দ্র মাথা নাড়ল।

'বুঝেছি।' নীলিমা এবার রীতিমত ভয় পেল। 'এমনি তো তিনি চব্বিশ ঘণ্টা রাগ করে আছেন। এসে তোয়ালের এই অবস্থা দেখলে কি আজ উপায় আছে।'

'তা বলেছেন সত্যি কথাই।' হেমেন্দ্র গুজগুজ করে হাসল। 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি ওটা তার চোখের সামনে ফেলে রাখছি না। আসবার আগেই সরিয়ে ফেলছি। এই জোড়ার আর একটা তোয়ালে আছে সেটা বার করে রাখলেই চলবে।'

'তাই করবেন।' অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে নীলিমা আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। এমন সময়, হঠাৎ দেখা গেল, পাঁউরুটি মুখে হেমেন্দ্রর টেরিয়ার এবং তোয়ালে মুখে নীলিমার বেড়াল ল্যাজ নাড়তে নাড়তে দিব্যি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

দেখে দু'জনই হতভম্ব।

ঠিক এরকম কিছু ঘটবে তারা প্রস্তুত ছিল না।

'একটু পরেই ওরা ফিরছে। নিচে তোয়ালে ও রুটির এই অবস্থা দেখলে ওপরে উঠে দু'জন দক্ষযক্ষ বাধাবে বুঝতে পারছেন তো।' কাতর চোখে নীলিমা হেমেন্দ্রর দিকে তাকাল।

শূন্যের ঝুলন্ত ষ্টেয়ারকেইসটার দিকে তাকিয়ে হেমেন্দ্র সে কথাই ভাবছিল।

'হ্যাঁ, পোষা কুকুর রাস্তায় নামবে না। নিচে রকে কি সিঁড়িতে বসেই পাঁউরুটিটা ছিঁড়ে খাবে। বাড়িতে ঢোকার সময় দৃশ্যটা চোখে পড়লে ওপরে এসে তিনি আপনার সঙ্গে কী ভীষণ ঝগড়া করবেন।'

'আর উনি!' নীলিমা বলল, 'এমন সুন্দর ধোয়া তোয়ালেটা কি পেত্নী এরি মধ্যে নোংরা না করে ছেড়েছে। উঃ ফিরে এসে তিনি যে কী রণতাণ্ডব শুরু করবেন ভেবে আমি এখনি নার্ভাস হয়ে পড়ছি। কী তার গলা, আমাদের বাথরুমে থেকে শোনা যায়।'

'দাঁড়ান অত ঘাবড়ালে চলে না।' হেমেন্দ্রের পুরুষকণ্ঠ গমগমিয়ে উঠল। 'গেটটা বন্ধ করে দিচ্ছি আমি।'

এবং নীলিমা কিছু বলার আগেই হেমেন্দ্র ছুটে গিয়ে প্যাসেজে ঢোকার কমন দরজা বন্ধ করে দিল।

'তাতে লাভ হল কি।' একটু অবাক হলেও চোখে তা প্রকাশ না করে হেমেন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে নীলিমা হাসল।

'আপনার বেড়াল কি আমার কুকুরকে এখন ডাকতে গেলে কিছুতেই আসবে না ওপরে, দু'টিতে খেলায় মত্ত এটা বুঝতে পারছেন তো।'

'তাও বটে', নীলিমা বলল, 'বরং ডাকতে গেলে এমন চিৎকার আরম্ভ করবে পাড়ার লোক জড়ো হবে। জিজ্ঞেস করবে সবাই কার পাঁউরুটি কাদের গামছা, কুকুরটা কোন্ ফ্ল্যাটের বেডালটা কোথা থেকে এল ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন।'

'এবং ইতিমধ্যে তাঁরাও এসে যাবেন, নয় কি?' হেমেন্দ্র নীলিমার চোখে চোখ রাখল।

'তাই।' নীলিমার ছোট্ট থুতনি হাসির ধমকে নড়ে উঠল। 'তখন আরো মুসকিলে, পডা যাবে।'

'কাজেই দরজাটা বন্ধ রাখা ভাল।' হেমেন্দ্র গলা পরিষ্কার করে বলল, আমাদের এই ব্লকে চোর ঢুকেছিল। আপনি বাথরুমে ছিলেন, আমিও ভিতরের দিকে ওই রকম একটা কিছু করছিলাম। টের পাইনি চোর কখন ঢুকল এবং কোন্ ঘর থেকে কি নিয়ে পালাল।'

'সেই ভাল।' নীলিমার হাসি ফোয়ারার মত ফেটে পড়ল। 'এমনি চুপচাপ থাকেন, কিন্তু বেজায় বুদ্ধি রাখেন দেখছি।'

'তা' আপনিই দেখছেন, আর একজনের চোখে লাগে না।' হেমেন্দ্র একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। 'যাকগে, নীচে পাঁউরুটির টুকরো আর তোয়ালে পড়ে আছে দেখলে চুরির ব্যপারটা আরো কনফার্মড্ হবে তাই না?'

নীলিমা মাথা নাড়ল।

'নিশ্চয়ই। চোর আমরা চোখে দেখিনি। তবে কেউ সদর খোলা পেয়ে ওপরে এসেছিল এবং তাড়াতাড়ি কিছু নিয়ে পালিয়ে গেল টের পেলাম কুকুর ও বেড়ালটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে যখন এক সঙ্গে নীচে নেমে গেল।'

'এই তো আপনার মাথাও বেশ পরিষ্কার হয়েছে এখন দেখতে পাচ্ছি।' হেমেন্দ্র আর তত জোরে হাসল না। 'ঠেকলে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে শাস্ত্রের বাক্য। আর, বলতে হবে ওদের, ছিঁচকে চোর এসেছিল। যারা শুধু রুটি-গামছা পেয়ে তুষ্ট থাকে।' বলে হেমেন্দ্র কড়িডোর কাঁপিয়ে হাসল।

'না না ঠাট্টা নয়।' নীলিমা বলল, এই ধরণের একটা কিছু সাজিয়ে না বললে আপনার গিন্নী আমার পুষিকে তার ওই নোংরা করা তোয়ালের ফাঁস জড়িয়েই মেরে ফেলবে, যা বদরাগী মানুষ।'

হেমেন্দ্র লজ্জিত হয়ে নীরব থেকে কথাটা সমর্থন করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমার টেরিয়ার দেখতে ছোট, কিন্তু শালার ভয়ানক বদমেজাজ। তিনি আপনার স্বামী, একটা পাঁউরুটির জন্যে বাড়াবাড়ি করলে ব্যাটা না আবার নীচেই কামড়ধামড় বসিয়ে দেয়। চুরির গল্প শোনার আগেই।'

নীলিমা গম্ভীর হয়ে বলল, 'তা আর আপনি ভেবে করবেন কি। যার যেমন কর্ম, কর্ম অনুযায়ী মানুষকে ফলভোগ করতেই হয়। খাক কামড়।'

'না না আমি বলছি না যে, কামড় ও দেবেই।' হেমেন্দ্র হাসল। স্বামীর মেজাজের ওপর নীলিমা ভিতরে ভিতরে এতটা রেগে আছে, যেন বিশ্বাস করছে না প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত হযে সে বলল, 'বলছি অ্যাক্‌সিডেণ্ট। যদি কামড়ে দেয়, তখন আমি লজ্জায় কোথায় মুখ রাখব। বিশেষ আপনার কাছে।'

'আচ্ছা যখন দেয়, তখন দেখা যাবে, এখনো ত দেয়নি।' হাল্কা হাসি দিয়ে নীলিমা হেমেন্দ্রেব দুর্ভাবনা ধুয়ে দিতে চেষ্টা করল। 'কী আশ্চর্য সুন্দর আকাশ একবার দেখুন।'

রেলিংএর ওপারে মাথা নিয়ে হেমেন্দ্র আকাশ দেখল। বৈশাখের রৌদ্রস্বচ্ছ ঘন নীল আকাশ। হেমেন্দ্র বলল, 'এপ্রিল মর্নিং স্কাই। রিয়্যালী এর তুলনা নেই।' আকাশ দেখা শেষ করে সে নীলিমাকে দেখল।

'চলুন একবার ছাদে যাই।'

'এখন!' হেমেন্দ্রর প্রস্তাব শুনে নীলিমা ইতস্তত করল। যেন সেটা লুকোবার জন্য তাড়াতাড়ি ও ওর হলুদ মাখা হাত দেখল।

'কি, রান্নাবান্না পড়ে আছে ভাবছেন বুঝি। ফিরে এসে সব তৈরী না দেখলে তিনি—'

'আহা সব দিনই সব কিছু তৈরী হয়ে থাকবে তার মানে আছে কি।' হেমেন্দ্রর প্রশ্নে নীলিমা খুশি কি না গলার ঝাঁজ থেকে তা বোঝা গেল। কিন্তু গলায় ঝাঁজ থাকলেও নীলিমার ঠোঁট ও ভুরুতে নীরব হাসি উকি দিয়েছে হেমেন্দ্রর দৃষ্টি এড়াল না।

'তা তো বটেই', হেমেন্দ্র বলল, 'মানুষ কল না যে, ঘড়ির কাঁটার মত সব কাজ—'

'সেসব কথা ছেড়ে দিন।' নীলিমার হাস্যবিচ্ছুরিত ভুরু কথা কয়ে উঠল।

'চোর এসেছিল তাই, যথেষ্ট। দুশ্চিন্তায় হাত চলেনি, কাজে মন বসেনি।' হিহি করে হাসল। 'আই সী।' হেমেন্দ্রও হাসল। 'আমার মাথায় আসে নি। এমন সুন্দর একটা কারণ রয়েছে। তা ছাড়া,—তা ছাড়া ফিরতে এখনো ওদের ঢের দেরি, আসুন, ছাদে গিয়ে গল্প করি।'

তথাপি নিজের হলুদ ছোপানো আঙুলগুলোর ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নীলিমা কুণ্ঠিতভাবে হেমেন্দ্রর দিকে তাকায়।

'হাত পায়ের কী অবস্থা হয়ে আছে। পরনে একটা ময়লা কাপড়। এই বেশে আপনার সঙ্গে ওপরে যেতে লজ্জা করছে।'

'রাখুন রাখুন।' নীলিমার কুণ্ঠা হেমেন্দ্র হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মত উড়িয়ে দিল। 'আমিই বা কোন্ ভদ্রলোক সেজে আছি গালে গলায় একগাদা সাবান নিয়ে লুঙ্গি পরে জানোয়ারের মত আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। না কি?'

নীলিমা তখনি একথার উত্তর দিল না। দিল ছাদে উঠে। একবার দুবারের বেশি গরম সিমেন্টের ওপর হাঁটা গেল না। ফুরফুরে হাওয়া ছড়ানো বৈশাখ সকাল সাবালক হয়ে এখন দুপুরের চেহারা ধরতে শুরু করেছে।

'এখানে বসুন, এখানে বসতে আপনার আপত্তি আছে কিছু?'

'না না, বেশ, জায়গা, একটু ধুলোময়লা নেই।' হেসে নীলিমা গঙ্গা জলের ট্যাঙ্কের চৌকোণ ছিমছাম ছায়াটুকুতে বসল। হেমেন্দ্রও বসল। এক মিনিটের রোদের ঝাপটায় নীলিমার গাল কপাল সিন্দুরে আমের মত টুকটুক করছিল। হেমেন্দ্রর মুখের সাবানের ফেনা শুকিয়ে রেণু রেণু হয়ে ঝড়তে শুরু করছে এই বেলা।

'লুঙ্গি পরলে খারাপ লাগেনা তো, উঁচু লম্বা শরীর আপনার লুঙ্গিতে চমৎকার মানায়।'

নীলিমার কোলের ওপর বিন্যস্ত ওর নিটোল সুন্দর হাত। হেমেন্দ্র সেদিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বলল, 'আপনার চোখে ভাল লাগছে। আর একজন দিনরাত আমার পিছনে লাগে। লুঙ্গি পরলে দর্জির মত কোচোয়ান খালাসীদের মত দেখায় আমাকে।'

'কী অদ্ভুত চোখ আশ্চর্য দৃষ্টি মানুষের!' অস্ফুট আক্ষেপের সুর বার করে নীলিমা আকাশ দেখল। হেমেন্দ্র বলল, 'আসল কথা ভাল লাগা।

আমাকে ভাল লাগছে না বলে এই পোষাকও তার চক্ষুশূল। এসম্বন্ধে কি আপনি আমার সঙ্গে একমত নন।'

'একশ বার। কেন হব না একমত। আমার জীবনে এই দৃষ্টান্তের অভাব আছে কিছু!'

'কি রকম?' প্রশ্ন না করে হেমেন্দ্র শুধু একটা ঢোক গিলল।

'আমার খোলা চুল দেখলে ওর পিত্ত জ্বলে যায়। সব সময় জড়িয়ে খোঁপা করে রাখো। চুল পিঠে নেমেছে ওর মেজাজ খারাপ হতে আরম্ভ হল।'

'কী অদ্ভুত রুচি, সংসারে কতরকম স্বভাবের মানুষ আছে। অথচ কী আশ্চর্য সুন্দর চুল আপনার! চোখ ফেরানো যায় না।'

হাওয়ায় বার বার খোঁপার আঁচল খসে পড়ে। বার বার নীলিমা আর তা তুলে দিতে গ্রাহ্য করে না। তাই হেমেন্দ্রও ওই ভ্রমরকৃষ্ণ খোঁপায় কি পরিমাণ চুল আছে এবং খোঁপা ভেঙে পড়লে কোমরের কতটা অবধি তা নামতে পারে মনে মনে জরীপ করল।

'মন', উদাস গলায় নীলিমা বলল, 'মনের মিল না থাকলে আর একজনের চুল নোখ চামড়া সব কিছুই চোখে খারাপ লাগে।'

'লাগে বৈকি।' হেমেন্দ্র ঘাড় নাড়ল। 'আমারও খুব খারাপ লাগে। চোখে নয় কানে। ঘুমোলে এমন বিশ্রী নাক ডাকতে আরম্ভ করে ও আমি একেবারে টলারেট করতে পারি না।' নীলিমা চাপা হাসল।

'তবু তো আপনার উনি ঘুমের মধ্যে শব্দ করেন, আমার তিনি, উঃ যখনই কিছু খাচ্ছেন মুখের এমন চপচপ ছপছপ শব্দ হয়—'

হেমেন্দ্র লঘু গলায় হাসল।

'কিছু খেতে চপচপ শব্দ হওয়ার কথায় আপনি আমার ইয়ের খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিলেন দেখছি।'

'কার?' চোখ বড় করে উৎসুকভাবে তাকাল নীলিমা।

'না উপমাটা ঠিক হবে না।' যেন নীলিমার অতিরিক্ত উৎসাহ দেখে হেমেন্দ্র হঠাৎ সঙ্কোচবোধ করল।

'আহা, শুনি না—আধখানা বলে থেমে গেলেন কেন, আপনার কে ওর মতন খেতে মুখের শব্দ করে?'

'আপনি অন্যরকম কিছু মনে করবেন।'

'মোটেই না', নীলিমা সহজ গলায় বলল, 'উপমা উপমা, এতে মনে করার কি আছে।'

'আমার টেরিয়ারের কথা বলছিলাম।' জলের ট্যাঙ্কের গায়ে চোখ রেখে হেমেন্দ্র আস্তে আস্তে বলল, 'ব্যাটা যখনই কিছু খায়, এমন চপচপ ছপছপ শব্দ করে!'

একটু সময় চুপ থেকে নীলিমা বলল, 'আশ্চর্য আপনি, কথাটা বলতে এত সময় লাগল আপনার। কেন আমি কি বলি না। রোজ বলি ওকে পশুরা শব্দ করে খায়।'

'আমি কি আর না বলে ছাড়ি মনে করেন। রোজ বলি ওকে তোমার নাকের আওয়াজ পাশের ফ্ল্যাটের বেড়ালটার ফোঁস-ফোঁসানি মনে করিয়ে দেয়।'

দুজন একসঙ্গে হেসে উঠল। এবং হাসতে হাসতে হঠাৎ তারা স্তব্ধ হয়ে গেল। উৎকর্ণ রুদ্ধশ্বাস হয়ে শুনল নিচে দরজা নড়ার শব্দ। 'ওরা!' হেমেন্দ্র চোখ বড় করে নীলিমার দিকে তাকায়।

'আমাদের উনি ফিরেছেন নিশ্চয়।' বিরক্ত বিষণ্ণ গলা নীলিমার। যেন নিজের মনে কথা বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়। 'কতক্ষণ আর বাইরে! কোথাও গেলে, কেবল দিশা থাকে কখন বাড়ি ফিরবে আর এসেই এটা ওটা নিয়ে আমায় জ্বালাতন করবে।'

হেমেন্দ্র উঠে দাঁড়ায়।

'আমার তিনিও ফিরতে পারেন এর মধ্যেই, আশ্চর্য না। তার বাইরে যাওয়া সেই যে বলে রাক্ষুসীর যাওয়া। কাছে গেছে বলে গেলে বুঝতে হবে দূরে গেছে। দেরিতে ফিরছি তার অর্থ এখনি ফিরছি।'

হেমেন্দ্রর কথায় নীলিমা এখন আর হাসল না। শুকনো গলায় বলল, 'চলুন, আর বসে থাকা এখানে নিরাপদ না।'

কিন্তু দুজনে নিচে এসে আর দরজা নড়ার শব্দ শুনল না।

'বাতাস।' নীলিমা একটা হাল্কা নিশ্বাস ফেলল।

'আমারও তাই মনে হয়েছিল তখন।' গাঢ় চোখে হেমেন্দ্র নীলিমার দিকে তাকায়। 'না, দেরি হবে আজ ওদের ফিরতে দেখবেন।'

কিন্তু তথাপি নীলিমা আলস্যভঙ্গের মত হাই তুলল, নিজের ঘরের দিকে তাকাল একবার।

'চলি।'

হেমেন্দ্র ব্যস্ত হয়ে মাথা নাড়ল। 'আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন। ঢের দেরি ওদের ফিরতে, এখনো সাড়ে ন'টা বাজেনি।' হেমেন্দ্র হাতের ঘড়ি তুলে নীলিমার চোখের সামনে ধরল।

'তা হলেও বাথরুমে ঢোকার উদ্যোগ আয়োজন করতে হয় এই বেলা, আপনারও তো স্নান হয়নি।' গ্রীবা ঘুরিয়ে নীলিমা হেমেন্দ্রর চোখে চোখ রেখে ক্ষীণ হাসির মর্মর তুলল। 'চুরির গল্পটার জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে ভুলে যাচ্ছেন।'

হেমেন্দ্র শব্দ করে হাসল।

'সে হবে তা যাবেন, আর কি। কড়া নাড়ার শব্দ হচ্ছে শুনে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলে আপনাকে আটকায় কে, কে এসে দেখছে। আসুন আমার ঘরে, আমি শেভ করব, ততক্ষণ বসে দুজনে গল্প করা যাবে।'

সঙ্কোচ বা দ্বিধার প্রশ্ন না, সময়ের সঙ্কীর্ণতা, তাই বুঝি ইতস্তত করছিল নীলিমা। হেমেন্দ্র তার হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে এল। 'বসুন।'

ঘরে ঢুকে আসবাবপত্রের একটু বিসদৃশতা যেন চোখে ঠেকল নীলিমার। সোফাসেটের মাঝখানে একটা খাট বিছানো। খাটের প্রান্তে ও পা ঝুলিয়ে বসল। হেমেন্দ্র বসল একটা চেয়ারে। সামনে টেবিলে তার দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম।

হেমেন্দ্র মোটা করে এক পোঁচ সাবানের ফেনা গালে মাখল। নীলিমা চারদিক দেখা শেষ করে আস্তে আস্তে বলল, 'এটা আপনার ড্রয়িং-রুম না?'

এক ধরণের ফ্ল্যাট কাজেই এবাড়িরও সামনের ঘর সম্পর্কে তার ধারণা অভ্রান্ত নয় যেন, এসম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল বলেই নীলিমা এরকম একটা প্রশ্ন করতে পারল।

প্রশ্ন শুনে হেমেন্দ্র আয়না থেকে মুখ না তুলে অল্প হাসল। 'হ্যাঁ, ড্রয়িং-রুম ছিল বটে। এখন ড্রয়িং-রুম কাম বেড-রুম করা হয়েছে।'

কথাটার অর্থ পুরোপুরি অনুধাবন করতে না পেরে অগত্যা নীলিমা প্রশ্ন করল, 'কেন আপনার কেউ অতিথি এসেছেন বুঝি, কে এলো?'

'অতিথি কেউ না।' হেমেন্দ্র আরশি থেকে চোখ তুলল। 'আমি,—আমাকে এঘরে রাত্রে এসে আশ্রয় নিতে হয়, কাজেই একটা খাট রাখতে

হয়েছে এখানে।' হেমেন্দ্র একটু সময়ের জন্য নীলিমার চোখের দিকে, স্থিরভাবে তাকায়।

ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল নীলিমা। মৃদু ঢোক গিলল তারপর চুপ করে রইল।

'আর কিছু প্রশ্ন করছেন না যে?' হেমেন্দ্র প্রশ্ন করল।

নীলিমা বলল, 'আপনি শেভ করতে আরম্ভ করুন, সাবান আবার শুকিয়ে যাচ্ছে।'

'তা তো করবই, করছি, তাড়া কি।' হেমেন্দ্র আরশির ওপর ঝুঁকে পড়ার ভাণ করল, কিন্তু সেদিকে তাকাল না। 'আপনি ভয়ানক চুপ করে আছেন।' হেমেন্দ্রর ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি।

নীলিমার চোখ জানালার বাইরে। যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে আকাশ দেখছে।

'ওর সারাক্ষণ রাগারাগি ঝগড়াঝাটি ভাল লাগে না। দিনের বেলা তবু একরকম কাটে, কাজেকর্মে বাইরে থাকা যায়। রাত্তিরটা অসহ্য। আমি ঠিক করেছি এখন থেকে এখানে শোব।'

নীলিমা ঘাড় ফেরায়। ম্লান বিষণ্ণ একটা হাসি ওর চোখেমুখে জেগেছে' হেমেন্দ্র লক্ষ্য করল।

'এধরণের একটা ইচ্ছা আমার'—

কথা শেষ হ'ল না নীলিমার, খটখট শব্দ করে প্যাসেজের দরজা নড়ে উঠল। নীলিমা চট করে খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। হেমেন্দ্রও চেয়ার ছেড়ে উঠল। দুজনে বেরিয়ে বারান্দায় এল, উৎকর্ণ রুদ্ধশ্বাস হয়ে নিচের শব্দটা শুনল। বিরক্ত হয়ে তারা সিঁড়িতে নামল। কিন্তু দুধাপ নামতে নামতে তাদের মনে হয় শব্দটা যেন আবার হঠাৎ থেমে গেছে।

'বাতাস!' হেমেন্দ্র ফিসফিসিয়ে উঠল।

নীলিমা বলল, 'আমার মনে হয় আপনার দুষ্টু টেরিয়ারটা এসব করছে।'

চশমখোর

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নীলমণি ভুল করেছে। বুঝতে পারল সে। দশটিকে বাতিল করতে হ'ল। মেয়ে। হঁ্যা মেয়েই সে চেয়েছিল।

চোখ তুলতে দেয়ালের ঘড়িতে দেখল তিনটে বেজে গেছে। আর কেউ আসবে না ঠিক ক'রে নীলমণি চেয়ার ছেড়ে উঠছিল। ইচ্ছা দরজায় তালা দিয়ে বাইরে রেস্টুরেন্ট থেকে একটু চা খেয়ে একটা পান মুখে ফেলে আসা।

নীলমণি ক্যাশ বন্ধ করল। এক ঝলক হাওয়া ঢুকল সামনের দরজা দিয়ে। বৈশাখী গরমের হল্কা। এখনও রাস্তার পিচ্ তেতে আগুন হয়ে আছে। গরম হাওয়ার সঙ্গে পিচ্-গলা গন্ধ খানিকটা।

নীলমণি নাকে রুমাল গুঁজতে যাবে এমন সময় মেয়েটি ভিতরে ঢুকল।

'আপনার দোকান?'

'হঁ্যা।' গম্ভীর হয়ে নীলমণি ঘাড় নাড়ল এবং মেয়েটিকে একটা নির্দিষ্ট চেয়ারে বসতে বলল। পাখা বন্ধ করে দিয়েছিল, পাখা চালিয়ে দিল।

মেয়েটি রুমাল দিয়ে কপাল ও গলা মুছল। গলার নিচে বুকের খানিকটা ব্লাউজের ভিতর পর্যন্ত রুমালটাকে যেতে দেখা গেল না যদিও।

কিন্তু অই খোলা একটুখানি জায়গায় দু'বার নীলমণি চোখ বুলিয়ে বয়সটা অনুমান করবার চেষ্টা করল। তারপর ওর চোখে চোখ পড়তে চট্ ক'রে চোখটা সরিয়ে দেয়ালে ঘড়ির উপর রাখল।

'আপনার নাম?' নীলমণি একটু পর চোখ নামাল।

'কল্পনা রায়।' মেয়েটি চোখ তুলল।

ভাসা-ভাসা চোখ। চেহারাটা মোটামুটি স্বাস্থ্যদীপ্ত। চোখ নামিয়ে নীলমণি ওর পায়ের দিকে তাকাল। স্যু। কিন্তু চামড়ার গায়ে বরফি কাটা থাকাতে পায়ের মাংস ও রং দেখতে নীলমণির অসুবিধা হ'ল না।

'আগে কোথাও কাজ করেছেন কি?'

'না।' ঢোক গিলে মেয়েটি বলল, 'এই প্রথম করতে বেরিয়েছি।'

নীলমণির মনটা নরম হয়ে গেল এবং আবার কাতরচোখে ওর গাল ও গলার মাংস দেখল।

যদি কিছু মনে না করেন, আপনার বয়েস জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

'বাইশ।' গাল লাল হ'ল না। কিন্তু নীলমণির চোখের দিকে তাকাল না ও।

না তাকালেও নীলমণি কাচের মত স্বচ্ছ দু'টো চোখের মণি ও নতুন পেয়ালার মত পরিচ্ছন্ন ধবধবে সাদা অংশটুকু দেখে ফেলেছে। এই চোখে চশমা উঠবে না। দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হবে না। দেখে নীলমণি নিশ্চিন্ত হ'ল।

কি আপনারা শুনলে অবাক হবেন, নীলমণির চশমার দোকান। সার্কুলার রোডের ওপর দোকানটা হয়ত কেউ কেউ দেখেছেন। হ্যাঁ, ঢ্যাঙ্গা মতন দেখতে, চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, এবং বয়সের অনুপাতে মাথার টাক একটু বেশী ছড়িয়ে পড়েছে। তা হলেও লম্বা গড়ন এবং কোট-পেণ্টুলন পরে থাকে বলে এবং নাকটা উঁচু তাই বয়সের অনুপাতে নীলমণিকে একটু বেশি ছটফটে মনে হয়। আপনারা শুনলে মোটেই অবাক হবেন না, চশমার দোকানের মালিক, তাই নিজে সে তিন রকমের চশমা পরে। সকালে একরকম দুপুরে একরকম, বিকেলে মানে সন্ধ্যার দিকে আর একরকম। একটার লেন্‌স ফিকে নীল. একটা গাঢ় বাদামী, একটার রং লাল্‌চে মতন। সন্ধ্যা পড়তে রাত্রের দিকে যেটা নাকে ওঠে। লাল চশমায় নীলমণিকে আরো বেশি চতুর কর্মঠ ও তেজী মনে হয়।

হ্যাঁ, অনেক বছর কষ্ট ক'রে টেনেটুনে দোকানটাকে সে তুলেছে যাকে ব'লে দাঁড় করানো। খদ্দের বেড়েছে, মালপত্র বেশী হয়েছে, এবং কাজ।

তাই একজন এ্যাসিষ্টেণ্ট রাখতে চায়।

রেখেছিল মাস ছয় আগে, একটি ছেলেকে। কিন্তু সুবিধা হ'ল না বলে নীলমণি ছাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর আর এই ছ'মাস সে কর্মচারী খোঁজেনি। একলা আছে। কিন্তু কতদিন আর একলা থাকা যায়। একটা সময় আছে, মানুষের একটা বয়স থাকে। একুশ বছর কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্লাস মাইনাস পাওয়ার গুণে, হাজার রকমের ফ্রেম ও নানা সাইজের লেন্‌স হাতিয়ে আর নাক মেপে মেপে নীলমণি হাঁপিয়ে উঠেছে।

বয়সের চাপ নয় মনের অবসন্নতা।

তবু যতক্ষণ খদ্দের থাকে ভাল।

না থাকলে আরো বেশি খারাপ লাগে নীলমণির যখন রাস্তার উল্টো দিকের হোটেলের সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ে। মাছ ডাল ভাত মাংস

শাকচচ্চড়ি। একুশবছরে আর একটাও আইটেম বাড়েনি এবং সেই যে দাঙ্গার পর সাইনবোর্ডের একবার রং ফেরানো হয়েছিল তারপর আর হয়নি। রোদ বৃষ্টি কুয়াশা ও ধুলো মাছ-ডাল-ভাত-মাংস শাকচচ্চড়ি খাচ্ছে তো খাচ্ছেই।

আর চোখে পড়ে হোটেলের পাশে ডাব সরবত ও কমলালেবুর দোকান।

বোতল এবং লেবুর সংখ্যা চিরকাল একরকম।

তা ছাড়া গরম পীচ বাস ট্রাম মানুষ এবং ইলেকট্রিক তার ও শেয়ালদার ধোঁয়ায় মলিন বিদ্‌ঘুটে আকাশটা তো আছেই।

হঁ্যা, হাঁপিয়ে ওঠে নীলমণি।

কাজের জন্যে যেমন লোকের দরকার, কথা বলতেও লোক চাই।

তাই মাঝে মাঝে দোকানে তালা দিয়ে সে চায়ের দোকান কি পান-সিগারেটের ষ্টলগুলোর দিকে বেড়াতে যায়, কথা বলতে। কিন্তু বেড়ানো শেষ ক'রে দোকানের দরজায় ফিরে এসে নীলমণির মন আরো বেশি খারাপ হয়ে যায়! হয়তো দেখা গেল কে-একজন চশমা নিতে এসে দোকান তালাবন্ধ দেখে ফিরে যাচ্ছে। ডাকাডাকি ক'রেও নীলমণি আর সেই খদ্দেরকে ফেরাতে পারলে না।

এসব অসুবিধা এড়াতে যা-ও একজন কর্ম্মচারী রাখল সুবিধা হল না। বলতে কি ছেলেটিকে ছাড়িয়ে দেয়ার পর নীলমণি ইদানিং আরো বেশি অসহায় ও একলা বোধ করছিল। স্যুটের সঙ্গে টাই পরার মতন। একবার এ্যাসিষ্টেণ্ট রেখে অভ্যাস হয়ে গেলে তারপর আর সেটি ছাড়া চলে না। বিপদ সেখানে।

অবশ্য, লোক বুঝবার ক্ষমতা হয়েছে নীলমণির, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আগে, মানে ব্যবসার আদিতে কি মধ্য অবস্থায়, সে যা-ই পরুক, যা-ই খাক, এখন সেসবের পরিবর্তন হয়েছে। গরম পড়তে আজ নীলমণির গায়ে সিল্ক ওঠে শীতে পশম। দামী সিগারেট ছাড়া অন্য কিছু খায় না। এক পয়সার জায়গায় দু'পয়সা দামের পানের খিলি অহরহ মুখে উঠছে, সঙ্গে আশি টাকা ভরির কাশীর জর্দা।

হঁ্যা, ছেলেটি চলে যাওয়ার পর প্রায় মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা হয়েছিল নীলমণির। এবং ওকে ছাড়িয়ে দিয়ে এই দু'মাস ভেবে ভেবে শেষটায় কাগজে বিজ্ঞাপন ছাড়ল। এবার ছেলে নয়, মেয়ে। মন

মাথা দোকান ও খদ্দের ঠিক রাখতে এর চেয়ে ভাল দাওয়াই আর কিছু নেই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার পর নীলমণি এটা মাত্র সেদিন আবিষ্কার করল। কিন্তু একটা ভুল করেছে সে। বিজ্ঞাপনে আঠারো থেকে বাইশ বছর বয়সের মেয়ে উল্লেখ করার সময় একবার ভেবে দেখেনি ঐ বয়সের শতকরা নব্বুইটির চোখে চশমা। এতকাল চশমার কারবার করে এটা তার বোঝা উচিত ছিল। এবং চশমাপরা দশটিকে বিদায় করার পর সে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। কল্পনা রায়কে দেখে নীলমণি হাল্কা নিশ্বাস ফেলল।

'কাল থেকেই আপনি তাহলে জয়েন করুন।'

মেয়েটি ঘাড় কাত করল।

'কোথায় থাকেন আপনি?'

'বাগবাজার।'

'তবে আর কি, বাস্-এ পাঁচ-সাত মিনিট লাগে এখানে আসতে।' নীলমণি মেয়েটির চোখ দু'টো আর একবার দেখল।

দু'একদিন দেখেই নীলমণি বুঝল কাজের মেয়ে। চটপটে। যেমন হাত-পা চলে তেমনি মুখ। খদ্দেরকে লেন্স্ কি ফ্রেম পছন্দ করিয়ে তবে ছাড়ে। দোকানে একবার মাথা গলিয়ে তারপর নাকে চশমা না ঝুলিয়ে কারো বেরোবার উপায় থাকে না। নীলমণি খুশি।

এখন প্রায় কিছুই করতে হয় না তার। কেবল ক্যাশ নিয়ে বসে থাকে। আর খদ্দের কেউ না থাকলে কল্পনার সঙ্গে গল্প করে। 'মিস্ রায়, মিস্ রায়, আসুন, এইবেলা একটু চা খেয়ে জিরিয়ে নিন।'

মনিবের এই ডাক কর্মচারীদের কানে চিরকাল সুধা ঢেলে এসেছে। তাই কল্পনাকেও মদির হেসে মন্থর পায়ে নীলমণির টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াতে দেখা যায়। চোখের ইঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে নীলমণি বলে, 'বসুন।'

কল্পনা উল্টোদিকের একটা আসনে মনিবের মুখোমুখি হয়ে বসে। কিন্তু নীলমণির চোখে মনিবের চোখ নেই। 'তারপর, চাকরি করতে এসে কেমন লাগছে, খুব বেশি একটা পরিশ্রম করতে হচ্ছে বলে কি মনে হচ্ছে আপনার?'

পাতলা ঠোঁট চায়ের কাপে ঠেকিয়ে কল্পনা মাথা নাড়ে। বাদামী লেন্স্-এর মধ্য দিয়ে নীলমণি অবাক হয়ে সেই মাথা নাড়া দেখে। তার চশমার রঙের জন্য মেয়েটির গায়ের রং বিকেলের রোদের মত দেখায়। নখের রং পাকা মোসাম্বি।

'একটু মাংস-পরটা আনিয়ে দিই ?' নীলমণির লম্বা ঘাড় নুয়ে টেবিলের সঙ্গে মিশে যায়।

নতুন পেয়ালার মত ঝকৃঝকে চোখে কল্পনা হাসে। 'না আমার ক্ষিদে পায়নি, শুধু চা-ই বেশ।'

'সেই কখন বেলা সাড়ে ন'টায় চারটি ভাত মুখে গুঁজে আসা হয়েছে।'

'তাই বলে বেলা একটা না বাজতে বুঝি মাংস পরটা খেতে হবে ?'

'তা খেলেনই বা, একটু খান।'

'না থাক।'

'না থাকবে না।' নীলমণি হঠাৎ ধমকে ওঠে। কল্পনা চমকে ওঠে।

'খেতে হবে আপনাকে। আমি মনিব আমার হুকুম মানতে হবে।'

নীলমণির মুখের দিকে তাকিয়ে কল্পনা অল্প অল্প হাসে। কেননা বাদামী লেন্‌সের দরুণ চোখের স্বাভাবিক রং দেখতে না পেলেও নীলমণির বাঁকা ঠোঁটের কোণায় হাসি ঝুলছে দেখে কল্পনার বুঝতে কষ্ট হয় না ধমকটা কৃত্রিম।

'বেশ খাব, আনান্, আপনাকেও খেতে হবে।' আর একটু স্বাভাবিক হয়ে ব'সে কল্পনা দুই হাত পিছনে নিয়ে খোঁপাটা চেপে ধরল।

তৎক্ষণাৎ দু' প্লেট মাংস ও পরটা এল।

নীলমণি সামনের দরজায় পর্দা টেনে দিলে। দোকানে সখ করে পর্দা খাটিয়েছিল সে বহুকাল আগে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে সেসব টেনে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছিল না এ-অবধি। আজ ডাব-সরবতের দোকান হোটেল-রেষ্টুরেণ্ট ও পান-সিগারেটের ষ্টলগুলোকে গুড্‌বাই জানিয়ে কল্পনার সঙ্গে খেতে খেতে নীলমণি দুনিয়ার গল্প করল।

'অনেকদিন আগেই আপনাকে আমার পাওয়া উচিত ছিল।' রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নীলমণি আবার বাঁকা ঠোঁটের কোণায় হাসি ঝুলিয়ে দিলে।

'ছেলেটিকে দিয়ে সুবিধে হল না কেন শুনি ?'

'আরে রাম! হারামজাদা আমার কারবারটা লাটে তুলতে চেয়েছিল।'

'কেন শুনি। কাজে ফাঁকি দিচ্ছিল খুব ?' কল্পনা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

মাথা নাড়ল নীলমণি।

'কাজেকর্মে ত্রুটী পাইনি আমি। কিন্তু স্বভাব ওর দেখে আমার মন শেষ পর্যন্ত কেমন খিঁচড়ে গেছল। কু-অভ্যাস।'

'কি করত?' বিস্মিত হলেও সেটা চেপে রেখে কল্পনা চোখের পেয়ালা হাসি দিয়ে ভরে তুলল। 'আপনার সামনেই সিগারেট টানত বুঝি ছোকরা।'

'সিগারেট টানলে আমার আপত্তি করার কিছু থাকত না, কিন্তু সেই দোষ না, অন্যরকম।'

মনিবের মুখের দিকে এবার ফ্যাল্‌ফ্যালে চোখে তাকায় কল্পনা।

'বাবুর চোখে চশমা ছিল, বুঝলেন।' ডান তর্জনীটা শূন্যে ঘুরিয়ে নীলমণি কল্পিত চশমা আঁকল। 'তারপর চশমা একবার চোখে উঠলে মানুষের যা স্বভাব দাঁড়ায় তাই ওর হয়েছিল।'

স্বভাবটা ঠিক কি আন্দাজ করতে না পেরে অবাক কল্পনা ঢোক গিলল।

'তারপর?'

'আজ ফ্রেম্‌ পাল্টাব, এটার জন্যে নাকে কেমন দাগ ধরে গেল, কাল লেন্স পাল্টাব, পাওয়ারের যেন কেমন নড়চড় হয়েছে, পরশু—'

নীলমণির গল্প বলার ঢং দেখে কল্পনা এবার শব্দ করে হেসে উঠল। 'তারপর'

'আপনি হাসছেন। আমার তো মনে হয় ও থাকলে দ্যাদ্দিনে আমার চশমার দোকান নীলামে উঠত।'

গম্ভীর হয়ে গেল কল্পনা।

'আমি ভালয় ভালয় বিদায় ক'রে দিলাম।' দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে নীলমণি বলল, 'বুঝলেন, মিস্‌ রায়, সন্দেশের দোকানের মনিব পেটুক কর্মচারীকে কখনো রাখবে না। এমনি তুমি দু'দিনের ছুটি চাও নাও, একদিন একটু সকাল সকাল বেরোতে চাও যাও, আজ টিফিন খাবার পয়সা নেই, চালিয়ে দিন, দিলাম। কিন্তু আসল জিনিস যখন কর্মচারী কিছু-দেখিয়ে কিছু-লুকিয়ে খেতে আরম্ভ ক'রে তখন মনিবের মাথার টনক নড়ে যায়। পরদিনই বলতে হয় 'যাও'। এখানে সন্দেশ বলতে আমি আমার লেন্‌স ফ্রেমগুলোকে বোঝাচ্ছি।' একটু থেমে নীলমণি পরে আবার বাঁকা ঠোঁটে হাসল।

'আপনার সম্পর্কে আমি এতটা নিশ্চিন্ত কেন বুঝেছেন তো। আপনার আগে দশটি ইণ্টারভিও হয়েছে। দশটিকে আমি বাতিল করেছি।'

'কেন ?' কল্পনা আবার একটা ঢোক গিলল।

'চশমা পরা ছিল সবগুলো মেয়ে।' নীলমণি হাসিটাকে আরো বাঁকা করল।

একটু হাসল কল্পনা।

'আমার চোখে চশমা উঠতে কতক্ষণ।'

'না উঠবে না।' নীলমণি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। এমন পদ্ম-পাপড়ি চোখ কাচে ঢাকা পড়লে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

কল্পনা মাথা খারাপ করল না। গাল দু'টো লাল করল।

এক একদিন চায়ের নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও গল্প হয়। খদ্দের কেউ না থাকলে তো কথাই নেই। গল্পে গল্পে বিকেল হয়ে যায়, বিকেল গিয়ে শেষটায় দাঁড়ায় সন্ধ্যায়। দোকানে আলো জ্বলে নীলমণির চোখে লাল লেন্‌স ওঠে।

'বুঝেছেন মিস রায়। থার্ড মেয়েটির গায়ের রং চাঁপার মতন ছিল।'

'আপনার রাখা উচিত ছিল।' কল্পনা ঠোঁট মোচড়ায়।

'কিন্তু কি করব বলুন।' সাহস পাচ্ছিলাম না। নীলমণিও হাসে। 'আমার মনে হয় আর যে-কোন দোকানে ওকে লুফে নেবে।'

'নেবেই তো।' কল্পনা থুত্‌নি নাড়ে। 'আপনি বোকা।'

'গাধা।' নীলমণি শব্দ ক'রে হাসে। 'কিন্তু আমি রঙের চেয়ে চোখকে বেশি মূল্য দিই। যে-চোখ দীঘির জলের মত টলটল করে। তার ওপর কাচের ঢাকনা নেই। সবটুকু সত্য।' নীলমণি সামনের দিকে একটু বেশি ঝুঁকে পড়েছিল। কল্পনার ভুরুর ধমকে সংযত হয়ে তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসল। দোকানে খদ্দের ঢুকেছে।

কি চাই ? না, চাই না কিছু।

খদ্দের একটা কাগজের ভাজ খুলে নীলমণির চোখের সামনে মেলে ধরল। হ্যাঁ, এই দোকানের ক্যাশ-মেমো। শেল্‌-এর ফ্রেম্‌। আমেরিকান জিনিস। ষোল টাকা ন'আনা দাম। কালকের তারিখ। মেমোর নীচে কল্পনার সই।

'কি হয়েছে ?' নীলমণি ভুরু কুঁচকালো।

'দামটা একটু বেশি নেয়া হয়েছে নাকি ? এই জিনিস, এই কোয়ালিটি, যাচাই ক'রে আমি দেখলাম অন্য দোকানে। বারো টাকার বেশি দাম হয় না।' খদ্দের নীলমণির দিকে তাকায়।

এক মুহূর্ত নীলমণি কল্পনার দিকে তাকায় তারপর খদ্দেরকে 'দাঁড়ান' বলে একটা প্রাইস-লিস্ট টেবিলের টানা থেকে টেনে বার করল। একবার চোখ বুলালো মূল্য-তালিকার ওপর, তারপর কথাটি না বলে ক্যাশ-বাক্স খুলে চার টাকা ন'আনা তুলে সেটা খদ্দেরের হাতে তুলে দিয়ে বিনীত হেসে বলল, 'একটু ভুল হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না। আপনি যে সরল ভাবে এসে আমাকে বললেন বড খুশি হয়েছি।'

'ধন্যবাদ।'

'নমস্কার।'

খদ্দের বেরিয়ে গেল।

কল্পনা নীলমণির লাল লেন্‌স-এর ওপর চোখ রাখল।

'আপনি প্রাইস-লিস্ট কন্‌সাল্‌ট করেন না, মিস রায ?'

'হ্যাঁ, করি, করেছিলাম বৈকি।' কল্পনা চেষ্টা করে হাসল। 'যেন দেখলাম তখন ওই দাম।'

নীলমণি গম্ভীর। একটু চুপ থেকে পরে বলল, 'অবশ্য ভুল হতে পারে আমি স্বীকার করি। চোখের ভুল কার না হয। কিন্তু কথা হচ্ছে কি এতে খদ্দের ফস্কে যায়,—ভাববে ইচ্ছ করে বুঝি—হযতো আর একদিন লোকটা আসবেই না। দরকার হলেও না।'

কল্পনা চোখ সরিয়ে বাইরে হোটেলের মাছ-ভাত-মাংস লেখা সাইনবোর্ডটা দেখে।

'থাক্‌গে, ও কিছু না, আসুন আর একটু চা খাই।' থম্‌থমে আবহাওয়া পাতলা করতে চেষ্টা করছে নীলমণি বোঝা গেল।

'না আমার ভীষণ লজ্জা করছে, এমন ভুল তো আর হয়নি কোনদিন।'

'আচ্ছা, ভুল হয়, ভুল মাঝে মাঝে সবাই করে। সেজন্য আপনি এত মন খারাপ করছেন কেন, আসুন।' কাউণ্টারের কাছে সরে গিয়ে নীলমণি কর্মচারীর হাতে মৃদু চাপ দেয়।

'পর্দাটা টেনে দিন।' খুব আস্তে বলল মেয়ে।

আর একদিন। দুপুর থেকে ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি।

খদ্দের নেই ব'লে নীলমণি মন খারাপ করল কি। মোটেই না। চুলে সাবান ঘসা হয়েছিল তাই আজ বেণীতে আবদ্ধ না থেকে পিঠময় ছড়িয়ে আছে

কল্পনার ফুরফুরে চুল। তেল না দেওয়ার দরুণ ঈষৎ বাদামী রং ধরেছে। তার ওপর চোখে পুরু ক'রে কাজল বুলিয়েছে মেয়ে। কপালে কুস্কুম।

'চুলোয় যাক খদ্দের, আসুন গল্প করি।'

নীলমণি পাপড়ভাজা আনিয়েছে, ডিমের বড়া, গরম চা।

'খেয়ে খেয়ে আমি আপনাকে ফতুর ক'রে দেব।' হাসল কল্পনা।

'পাগল।' নীলমণি হাসল না 'কত আর খাবেন ওই ছোট্ট পেট নিয়ে। খান। বাদলায় পাপড় আর ডিমের বড়া জমবে ভাল।'

বেশ জমে উঠেছিল গল্প!

এমন সময় দরজায় কালো বর্ষাতি মোড়া কে একজন খদ্দেরের আবির্ভাব। মুখে বিষন্ন ভাব চোখে বিরক্তির ঘনঘটা।

ব্যস্ত হয়ে নীলমণি উঠে দাঁড়ায়।

বর্ষাতি না ছেড়ে তিনি সোজা কাউন্টারে চলে আসেন। কল্পনা খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

'আপনারা কি মশাই চোখের মাথা খেয়েছেন', কল্পনার দিকে তাকাল না খদ্দের নীলমণির দিকে চোখ।

'কি ব্যাপার?' নীলমণি ঢোক গিলল। এবং এখন খদ্দেরটিকে চিনতে তার কষ্ট হ'ল না। পরশু লেন্‌স নিয়ে গেছে। মাইনাস।

'পাওয়ার ঠিক হয়নি।'

'কেন, গণ্ডগোল হবার তো কথা নয়। আড়চোখে একবার কল্পনাকে দেখে নীলমণি হাত বাড়িয়ে খদ্দেরের হাতে ধরা ডাক্তারের প্রেসক্রপশন ও চশমাজোড়া তুলে নেয়।

'গণ্ডগোল হয়েছে কিনা আপনি নিজে একবার দেখুন। সব সময় কি আর কর্মচারীর উপর ভরসা করা চলে।' বলে বেশ কট্‌মটে চোখে খদ্দের এলোকেশী কাজল কুস্কুম পরা কল্পনাকে দেখল। মেঘলা আকাশের মত থমথমে হয়ে আছে মেয়ের চেহারা।

কিন্তু সেদিকে নজর দেবার সময় ছিল না নীলমণির। ব্যস্ত অভিজ্ঞ চোখ দু'টো দিয়ে সে প্রেসক্রপশনের পাওয়ারের সঙ্গে লেন্‌স-এর পাওয়ার মেলায়। তারপর একসময় কথাটি না বলে চট্ ক'রে শো-কেইসের ডালা তুলে আর একটা ফ্রেমে আটকে সেটা খদ্দেরের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'দেখুন তো এবার।'

নতুন লেন্‌স চোখে পরে খদ্দের দেয়ালের লাল কালো A B C D a b c d পড়ল। একবার বাইরে হোটেলের বৃষ্টি-ভেজা সাইনবোর্ডটা দেখল। 'হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে। খুব কারেক্ট জিনিস চোখে উঠেছে মনে হচ্ছে।' খুশি চোখে খদ্দের নীলমণির দিকে তাকায়।

'·3 ভুল ক'রে ·4 দেয়া হয়েছিল।' বিনীতভাবে হাসল নীলমণি। 'আশা করি এইটুকুন ভুলের জন্যে ক্ষমা করবেন। ভবিষ্যতে আর এরকম হবে না আপনাকে আমি এসিওরেন্স দিচ্ছি। আবার কিছু দরকার হলে পায়ের ধুলো দেবেন।'

'তা দেব, তা হযতো দেব, কিন্তু—বিড়বিড় ক'রে খদ্দের কি জানি বলল, কি যেন বলল না। আর একবার কটমট ক'রে কাউন্টারের কোণায় দাঁড়ানো মেয়েটিকে দেখল।

'কিন্তু সেদিন তো আপনি অসুবিধা কিছু বললেন না। পয়েন্ট এইট চোখে পরে বললেন ঠিক আছে।' একটু মিষ্টি হেসে কল্পনা নিজের ক্রটী এবং সেই খদ্দেরের ভ্রম ও উল্লেখ করল।

'তা বলিনি কিছু, কিন্তু খানিকক্ষণ চশমাটা চোখে রাখার পর মনে হ'ল কোথায় যেন বেঠিক লাগছে। গেলাম ছুটে আবার আমার চোখের ডাক্তারের কাছে। দেখেই বললেন দোকানদার wrong power চশমা তুলে দিয়েছে আপনাকে। শিগ্‌গীর গিয়ে পাল্টে নিয়ে আসুন।'

কথা শেষ ক'রে খদ্দের আর দাঁড়াল না, কল্পনার দিকেও তাকাল না।

'আচ্ছা, চলি মশাই।' নীলমণির দিকে মুখ ঘুরিযে মাথাটা ঈষৎ নেড়ে সে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

কল্পনা চুপ। গম্ভীর।

নীলমণি গম্ভীর। বিষণ্ণ।

বাইরে বৃষ্টির ঝিরঝিরানি তেমনি চলেছে। হয়তো আর একটু পর রাস্তায় জল জমতে আরম্ভ করবে। চপ্‌ চপ্‌ ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ হচ্ছে গাড়ি ঘোড়া চলার।

'ইদানিং ভুলচুকটা একটু বেশি হচ্ছে নাকি মিস রায়?' ঢোক গিলে নীলমণি প্রশ্ন করল।

কল্পনা অবনতমুখী। নীরব। ব্যাগটা আস্তে হাতে তুলে নেয়।

'আপনি কি এখুনি চললেন?' নীলমণি আর একটা ঢোক গিলল।

ঘাড় নাড়ল কল্পনা।

'মাথাটা কেমন বিশ্রী টিপটিপ করছে।'

'খারাপ ওয়েদার তাই এমন হচ্ছে। আচ্ছা বেশতো, দু'টো বাজে। আজ চলে যান আপনি। শরীরটা খারাপ যখন।'

আর কথা না বলে ছাতা ও ব্যাগ হাতে কল্পনা রাস্তায় নেমে পড়ল।

পরদিন নীলমণি তার এ্যাসিষ্টেণ্টের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখখানা বাংলা পাঁচের মত করে ফেলল।

রুদ্ধস্বরে সে প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ?'

কল্পনা ঈষৎ হাসল।

'যা ভয় করেছিলুম। ক'দিন ধরে বিকেলের দিকে মাথা টিপটিপ করছিল। তার ওপর দু'দিন আপনার এখানে কী ভীষণ ভুল করলুম কাজে। কাল বাড়ি ফেরার পথেই শ্যামবাজারে আমার এক জেঠতুতো ভাইয়ের চেম্বারে চোখটা দেখালুম। যা সন্দেহ করেছিলুম।'

কেমন নিভে গেছল নীলমণি। স্তিমিত ক্ষীণ গলায় প্রশ্ন করল, 'চশমা কার কাছ থেকে?'

'বাগবাজারে আমার মাসতুতো ভায়ের চশমার দোকান আছে।'

'তাই বলুন।' নীলমণি হাসতে চেষ্টা করল। এবং মনিবকে আর একটু অভয় দিতে কল্পনা হাসিটা আরো সুন্দর ক'রে বলল, 'শত হোক সম্পর্কে ভাই তো, কিছুতেই দাম নিতে চাইলে না। বললে, আবার কিছু পাল্টাবার দরকার হলে এখানে চলে এসো।'

মনের মেঘ কাটলো কি নীলমণির। রাস্তার ওপারে সরবতের দোকানের দিকে চোখ রেখে আস্তে বলল, 'ভাল।'

কিন্তু কল্পনার হাস্য বিচ্ছুরিত চাউনি মনিবের মুখের দিকে তেমনি ধরা আছে।

'এই ফ্রেমে আমাকে মানিয়েছে?'

'হুঁ।'

'এই প্যাটার্ণের লেন্‌স আমার পছন্দ, আমার মনে হয় অন্য কিছু আমার চোখে ভাল মানাবে না, কেমন?'

'হুঁ।'

সংক্ষেপে শেষ ক'রে নীলমণি অনেকদিন পর পান খেতে বাইরে গেল। এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সে নিজের মনকে বোঝাতে চেষ্টা করল। 'মন

খারাপ করা আমার উচিত না। ওর চশমার রোগ হয়েছে হোক। মাসতুতো ভায়ের দোকান আছে, দরকার হলে এটা-ওটা ওখান থেকে নেবে বলছে, কাজেই—'

হৃষ্টমনে দোকানে ফিরে এল নীলমণি। পানের রসে দুই ঠোঁট লাল।

চশমাপরা মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে!

'হাসছেন এত?'

'একটা কারণ ঘটেছে।'

'কি কারণ শুনি না?'

কিন্তু কারণটা বলি বলি করেও কল্পনা চেপে রাখছে। এক পা এগিয়ে গিয়ে নীলমণি এ্যাসিষ্টান্টের হাত চেপে ধরল।

'আঃ ছাড়ুন, কেউ দেখবে?'

'দেখুক।' নীলমণি হাত ছাড়ল না। 'চশমা পরলে আপনাকে এত সুন্দর দেখায় আমার ধারণা ছিলনা।'

'সুন্দর।' কল্পনা এবার খিল্‌খিল্ হেসে উঠল। 'আর একজন কিন্তু অন্য কথা বলে গেল।'

'কে?' ঢোক গিলল নীলমণি, 'কি বলল?'

'একজন খদ্দের।' কল্পনা এবার মুখে আঁচল চাপা দিতে গেল! নীলমণি বাঁ-হাতে আঁচলটা ধরল। 'খদ্দেরের ভাষ্যটা শোনাতে এত আপত্তি কেন বুঝতে পারছি না।'

যেন নীলমণি রাগ করেছে। গলার স্বর থমথমে শোনায়।

'মাইরি, আপনাকে জড়িয়ে কিছু বলেনি।' মনিবকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করল কল্পনা। 'বলছিল, চশমা পরাতে আমাকে ভীষণ স্মার্ট দেখাচ্ছে।'

'তা তো দেখাচ্ছেই।' উদাস স্খলিত কণ্ঠস্বর নীলমণির। তা হলেও সেটা খুব বেশি প্রকাশ করতে না দিয়ে হাসল সে। 'জবুথবু মেয়ে সুন্দর হলেও আমার কাছে সুন্দর ঠেকে না। স্মার্ট হওয়া চাই। এতে তাদের সৌন্দর্য্য বাড়ে। সেজন্যেই তো বলছিলাম খুব সুন্দর লাগছে আজ আপনাকে।'

'ভাগ্যিস চোখটা খারাপ হ'ল।' ঠোঁট তের্‌চা করে হাসে কল্পনা। নীলমণির মুখ লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু খুব বেশি সেটা প্রকাশ না পায়, তাই তাড়াতাড়ি বলল, 'আসুন এবেলা একটু চা খাওয়া যাক।'

'আজ একটু সকাল সকাল খাওয়া হচ্ছে নাকি ? দেয়ালে ঘড়ির দিকে চোখ ফেরাতে চাইছিল মেয়ে। একটাও বাজেনি।'

'না বাজুক।' দ্রুত ব্যস্ত পায়ে দরজায় গিয়ে গলা বাড়িয়ে চা-ওয়ালাকে ডেকে চা-এর কথা বলে নীলমণি পর্দা টেনে দিলে।

সারাদিনের আলাপে-প্রলাপে আর এক ফোঁটা মেঘ ছিল না নীলমণির মনে। চৈত্রের আকাশের মত টন্‌কো মাজাঘসা হয়ে উঠেছিল। অঘটন ঘটল সন্ধ্যার দিকে। রীতিমত ঝড়।

নুয়ে একটা শো-কেসের ডালা তুলতে গেছে কল্পনা। কাঠের শক্ত কোণাটা ঠুং করে এসে লাগল ওর চোখে। চোখ বাঁচল। চশমাটি ভাঙল। দশ টুক্‌রো হয়ে কাচের টুক্‌রোগুলো শো-কেসের ডালার ওপর ছিট্‌কে পড়ে ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ তুলল।

'কি ব্যাপার ?' নীলমণি ছুটে এল।

কল্পনা আড়ষ্ট, হতভম্ব।

'দু'টো লেনসই গেছে ?' খস্‌খসে গলা নীলমণির।

কল্পনার মুখে কথা আটকে গেছে।

'দৈবের হাত পা নেই, করা কি।' একটু পর ভাঙ্গা নিস্তেজ গলায় নীলমণি বলল, 'টুকরোগুলো সরিয়ে ফেলুন। ঝাড়নটা নিন। একটা কাগজে তুলে বাইরে ফেলে দিতে হবে।'

কল্পনা মৃতের মত স্থির।

'আমার কথা শুনছেন, ঝাড়নটা নিন।'

কিন্তু এবারও সে মনিবের কথা কানে তুলল না। অগত্যা নীলমণি একটা আলমারীর পিছন থেকে ঝাড়নটা এনে কল্পনার হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করল।

কল্পনা এক ঝট্‌কায় নীলমণির হাতটা সরিয়ে দিলে।

'আপনার দেখছি ভয়ানক দুঃখ হয়েছে একটা চশমার জন্যে।'

'তা হবারই কথা।' কল্পনা ভাঙ্গা টুক্‌রোগুলো দেখছিল। ভাঙ্গা গলায় সে কথা বলল।

নীলমণি দেখছিল কল্পনার সাবান-ঘসা ফাঁপা চুল। কাজলটানা চোখ। হাতের নখ আজও রং করে এসেছে। দিনের শেষে এটা এই প্রথম নীলমণির চোখে পড়ল।

'কেন, দুঃখের কি।' নীলমণি ঝাড়নটা আর ওর হাতে তুলে দিতে চেষ্টা না করে বলল, 'মাসতুতো ভাই আর এক জোড়া লেন্স দেবে। ফেরার পথে দোকানে না হয় একবার লেন্স আনান। বাগবাজারে দোকান বলছিলেন না তখন।'

'তা তো যাবই না গিয়ে উপায় কি। তা বলে তো আপনার কাছে চাইব না একটা।'

'কেন, না হয় আমিও একটা দিলাম। একজোড়া লেন্স ইচ্ছা করলে আমিও আপনার জন্যে ছাড়তে পারব।' বলে ঈষৎ হেসে ঘাড়টা দুলিয়ে নীলমণি আবার এ্যাসিষ্টেণ্টের হাত ধরতে গেল।

'এই, আপনি বার বার আমার হাত ধরবেন না।' নীলমণি থমকে দাঁড়াল।

কল্পনা তার ব্যাগ গুছোতে লাগল।

'আপনি কি আজও সাতটার আগেই বাড়ী চললেন নাকি। জানেন এটা শিয়ালদা। এখানে রাত দশটা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখতে হয়। বেচাকেনা চলে।'

'তা রাখুন আপনি খোলা। এতকাল তো একলাই রেখে এসেছিলেন। আমি চললাম।'

'কাল থেকে তা হলে আপনি আর এখানে কাজে আসছেন না ?'

'না।' কল্পনা গলা শক্ত করল।

নীলমণি তার লাল চশমাজোড়া পকেট থেকে তুলে নাকে বসাল। দোকানের সবগুলো আলো জ্বেলে দিলে। বাইরে গিয়ে কড়া জর্দা দিয়ে একখিলি পান খেতে ভয়ানক ইচ্ছা করছিল তার।• কিন্তু কল্পনার ওপর রাগ হওয়ার ইচ্ছাব মতন সে এই ইচ্ছাটাও দমন করল।

বেশ চেষ্টা করে একটু হেসে বলল, 'কেন, আমি কী অপরাধ করলাম ?'

কল্পনা এবার দেয়ালের দিকে তাকাল। এবং কর্মচারী হয়ে মনিবকে কড়া কথা বলছে কথাটা মনে পড়তে যেন ঈষৎ হেসে ওটাতে খানিকটা ঠাট্টার রং মাখিয়ে বলল, 'চশমখোরের চাকরি আমি করি না। আজ যদি আমি আপনার কাছে একটা লেন্স ভিক্ষে চাই আপনি আমার কাল থেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করবেন।'

'কে বললে শুনি না।' নীলমণি গলাটা খরখরে করে ফেলল।

'আপনার মুখেই শুনেছি। আগের ছেলে কর্মচারীটি তিন টাকা দামের একটা ফ্রেম চেয়েছিল বলে তাকে আর কাজে রাখেননি।'

'তা রাখিনি সে ছেলে ছিল বলে ... আপনি মেয়ে। কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন।'

বলে যেন অত্যন্ত আবেশ ভরেই নীলমণি ওর হাত না ধরে হাতের ব্যাগটা চেপে ধরল। অর্থাৎ 'তোমায় আমি যেতে দেব না।'

কল্পনা চোখ ঘুরিয়ে বাইরের সাইনবোর্ডে ভাত ডাল মাংস দেখছিল।

'ছাড়ুন।' বিরক্ত হয়ে ব্যাগটা ছাড়িয়ে নিয়ে নীলমণির দোকান পরিত্যাগ করার সঙ্কল্পে সে হঠাৎ কঠিনতর হয়ে উঠল।

নীলমণি বলল, 'দাঁড়ান পর্দাটা টেনে দিয়ে আপনার সঙ্গে কথা হবে। আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধ আছে।'

বলে বেশ জোর করেই নীলমণি মেয়েটির হাত ধরতে চেষ্টা করল।

গলায় একটা ধাক্কা মেরে ব্যাগটা ছাড়িয়ে নিয়ে কল্পনা সরতে চেষ্টা করল। কিন্তু করলে হবে কি পারল না। কি করে পারবে। সে মেয়ে ও পুরুষ। বরং ধাক্কা দিতে গিয়ে সে নিজেই ছিটকে পড়ল দরজার কাছে।

ব্যাগটা নীলমণির হাতে থেকে যায়। তাই সে কল্পনার দিকে তাকিয়ে ফ্যা ফ্যা করে হাসে।

কল্পনা উঠে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক ক'রে শাড়ি ঠিক করে। আকর্ণ ও লাল হয়ে উঠেছে। রাগ দুঃখ লজ্জা না ঘৃণা ঠিক কোন্‌টা নীলমণি বুঝতে পারল না।

কিন্তু কল্পনা তার ব্যাগের জন্যে আর এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল না।

'রেখে দিন, ওটা ভিক্ষে দিয়ে গেলাম, থুঃ, সাড়ে তিনটাকা দামের প্ল্যাষ্টিকের ব্যাগ আমি আবার একটা খুব কিনে নিতে পারব।' বলে দ্রুত দীর্ঘ পায়ে চৌকাঠ পার হয়ে ও নেমে গেল রাস্তার ভিড়ে।

অনেকক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে নীলমণি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বাইরে গিয়ে একটা জর্দা-পান মুখে দিতে ভীষণ ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সেই ইচ্ছা দমন ক'রে একটা চেয়ারে বসে পড়ে সে কল্পনার ব্যাগের মুখ ফাঁক করতে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি ব্যাগটাকে টেবিলের ওপর উপুড় ক'রে ধরল।

'কুত্তী, কুত্তী।' নীলমণি চিৎকার ক'রে উঠল। এবং একটু প্রকৃতিস্থ হবার পর গুণে দেখল তিনডজন লেন্‌স আর রোল্‌গোল্ড নিকেল শেল্‌ সব মিলিয়ে উনিশটা ফ্রেম। সারাদিনের মধ্যে কখন দোকান ছেড়ে বাইরে গেল মনে করতে পারল না।

ঘড়ি বন্ধ।

আজ তিনদিন চাবি পড়ছে না। সতেরো টাকা দামের টেবিল টাইম-পীস। তাও যুদ্ধের আগের কেনা জিনিস ছিল ব'লে চাবি না দেওয়ার পরও পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা দম রেখে ঠুকুর ঠুকুর ক'রে চলছিল। আজ ভোর পাঁচটা থেকে একেবারে থেমেছে।

ঘড়ির দোষ নেই।

দু'জনের কথা বন্ধ হয়েছে, ওটাও বন্ধ থাক এই যখন ওদের মনের ভাব, ঘড়িও আপনা থেকে বন্ধ হ'ল।

জোয়ারদাব ঘড়ির মালিক।

কিন্তু মালিক হলেও ওটা দেখেই আফিসে যায় বলে সেবার রায়টের সময় ঘড়িটার যখন ফুসফুসের অসুখ ক'রে থেকে থেকে দমবন্ধ হয়ে যেতে লাগল তখন আটটি টাকা গাঁট থেকে দিয়ে বটব্যাল ঘড়ির অসুখ সারিয়ে আনে। হয়তো জোয়ারদার সেকথা ভুলে গেছে, বটব্যাল ভাবে।

ইদানিং দু'জনের রাগের পিছনে একটি কারণ ঘটেছে। তাই উপস্থিত দু'জনের যা সাধারণ স্বত্ব, অর্থাৎ জানালার ধারে পায়াভাঙা টেবিলে রক্ষিত পুরোনো টাইম্‌পীসটাকে বাহন ক'রে রাগটা আরো বেশি প্রকাশ পেতে লাগল।

'আমার বয়ে গেছে চাবি দিতে, শালা বটব্যাল অফিসে লেট্ হাজিরা হোক আমি রোদ দেখে বেলা ঠিক আন্দাজ ক'রে নেব।' জোয়ারদারের মনের কথা এই।

বটব্যাল ভাবে, লেট্ হাজিরা দিয়ে দিয়ে জোয়ারদারের যদি চাকরি যায় সে সবচেয়ে বেশি খুশি হবে।

অথচ গত শুক্রবার পর্যন্ত দু'জন অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিল। সতীশ জোয়ার-দার আর রমেশ বটব্যাল। একজন বীরভূম একজন বাঁকুড়ার হলেও কতকাল ওরা দু'জন এক মেসে এসে ঠাঁই নিয়েছে। আছে একই ঘরে এবং এক অফিসে চাকরি, একরকম স্কেল মাইনের। একই ঘড়ি

দেখে পান চিবোতে চিবোতে গলাগলি ক'রে দু'জন মেস থেকে বেরিয়ে ড্যালহৌসীর ট্রামে চেপেছে। ট্রামে যেতে যেতেও দু'জনের গল্প করার বিরাম ছিল না। কুড়ি বছর সমানে তারা এই করেছে। আজ তিনদিন তাদের কথা বন্ধ থাকার কারণ কি! কেবল কি কথা বন্ধ! এ ওর মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে মনের এই ভাব।

জোয়ারদার ইঙ্গিতে একটা বিড়ি চেয়েছিল। বটব্যাল তার চটির নীচে থেকে একটা পোড়া বিড়ির টুক্‌রো তুলে বন্ধুর দিকে সেটা ছুঁড়ে দিয়েছে। এত ঘৃণা, এমন বিদ্বেষ।

অবশ্য কারণটা খুব হাল্কা নয়।

সব কারণের মূল মেসের ঝি কমলা। অসহায় বিধবা মেয়ে। বাবুদের এঁটো বাসন ধোয়, জল তোলে এবং সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরও ও যেটুকু যৌবন জীইয়ে রাখতে চাইছে, বাকি সব ছেলে ছোক্‌রা বলে ধরতে পারে না, ধরে ফেলেছে রমেশ বটব্যাল সতীশ জোয়ারদার। ধরতে পেরে চুপ ক'রে থেকেছে দু'জনই।

সেই কমলা, সেদিন অফিসে যাবার আগে দুই বন্ধু যখন খেতে বসবে দেখা গেল জোয়ারদারের জলের গ্লাশটা বেশ ভাল ক'রে সাবানজল দিয়ে ধুয়ে তাতে জল ঢেলে পরে বাবুকে এগিয়ে দিয়েছে, আর, বুঝি অন্য কাজের তাড়া ছিল দাগধরা আঁশগন্ধী একটা গ্লাশে জল ঢেলে বটব্যালের পাতের সামনে রেখে ঘর থেকে পালিয়েছে।

বাস্‌, আর যায় কোথায়। অফিসে যাবার সময় রাস্তায়, অফিসে টিফিনের ঘণ্টায়, অফিস সেরে মেসে ফিরে এসে সারা সন্ধ্যা, এমন কি রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শুতে গিয়েও বটব্যাল জোয়ারদারকে অনর্গল খুঁচিয়েছে। 'এর মানে কি, জোয়ারদার, আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে তুমি কাঁঠাল খাচ্ছো!'

'ছি ছি!' বার বার জিভে কামড় দিয়ে জোয়ারদার শপথ করেছে। 'কাজের কথা ছাড়া ওর সঙ্গে কোনোদিন একটা বেশি কথা বলেছি তুমি দেখেছ? আমার সেই স্বভাবই না। এটা মেস, মেয়েছেলে নিয়ে কারবার বোঝ তো।'

'সব বুঝেছি,' বটব্যাল রাগে গজগজ ক'রে বলল, 'শোধ তুলব, আমি এর শোধ তুলব। শালীকে কাল তিনবার বলে আমার তোষকটা

ছাদে পাঠিয়ে রোদে দেওয়াতে পারলাম না। ওর হাতের কাজই শেষ হয় না।'

শুনে জোয়ারদার চুপ করে ছিল।

এবং পরদিন সকাল থেকে দেখা গেল দু'জনের বাক্যালাপ বন্ধ।

আজ রবিবার অফিস ছুটি।

তাই দু'জনে দু'জনের তক্তপোষের ওপর ব'সে ঝগড়ার খুঁটিগুলি আরো শক্ত ক'রে পুঁততে লাগল।

বটব্যাল দাড়ি কামাবে। আবশি ও কামানোর সরঞ্জাম খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করল তার বেজাবের ব্লেডটা পাওয়া যাচ্ছে না। নতুন ব্লেড। মাত্র একদিন সে ব্যবহার করেছে। 'শালা চুরি আরম্ভ হয়েছে মেসে, এই ঘরে চুবি হচ্ছে।' যেন ঘবের দেয়ালের সঙ্গে বটব্যাল কথা বলছে। 'একটা ব্লেড নিতে কি আব বাইরের লোক আসবে, ঘরের মানুষের কাজ এসব,—শালা যত চোর ছ্যাঁচোর নিয়ে আমার বাস।'

দেয়াল-মুখ ক'রে ওদিক থেকে জোযাবদার বলল, 'শালা এক আনা দামের ব্লেড দিয়ে সতীশ জোয়াবদার দাড়ি কামায় না।' বলা শেষ ক'রে, জুতো পালিশ করতে হবে, তাড়াতাড়ি উঠে সতীশ বুরুশ খুঁজতে গিয়ে দেখে সেটা পাওয়া যাচ্ছে না।

'শালা ঘবে কুকুব এসেছিল, জুতো না পেয়ে বুরুশটা মুখে তুলে নিযে পালিয়েছে। যত কুত্তা ছাগলের বাসা হয়েছে এটা। মেসে ভদ্রলোক থাকে না।'

'ভদ্দরলোকেরা ফুটপাথে থাকে, নর্দমায় ডাষ্টবিনে থাকতে সুরু করেছে।'

এই ক'রে ক'রে দু'জনের হাতাহাতি বাধতো,-বাধল না। দু'জনেই চমকে দরজার দিকে চোখ ফেরাল। কমলা। কপালে টিপ চোখে কাজল। ছুটির সকালে কাজের চাপ একটু কম বলে চানটান করে সেজেগুজে নিয়েছে।

'ও হরি, এ যে নিমতলা হয়ে আছে গো।' ঘড়ির দিকে কমলার চোখ।

বটব্যাল ও জোয়ারদার অন্যদিন হাসাহাসি করত, আজ নীরব।

'উঠুন আপনারা, এগারোটা বাজে। ঠাকুর ডাকাডাকি করছে।'

কমলার কথায় দু'জনে উঠে দাঁড়াল।

'চট্ ক'রে চান ক'রে ওদিকটা সেরে দিন। ছোকরাদের হয়ে গেছে, ঠাকুর আজ সিনেমায় যাবে।' কথা শেষ ক'রে কমলা দু'জনের চোখের

দিকে তাকিয়ে মদির হাসল, তারপর চোখ নামাল। তিনদিন পর এই প্রথম বটব্যাল ও জোয়ারদারের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়। তারপর আর তিল বিলম্ব না ক'রে সাবান গামছা হাতে দু'জনে কলঘরের দিকে ছুটে গেল।

বাবুদের স্নান সারা হ'তে না হ'তে কমলা ঠাঁই করে দেয়। দু'জনের গ্লাশ ও থালা দু'টো বেশ ভাল ক'রে সাবানজল দিয়ে ধুয়ে মুছে দু'টি আসনের সামনে রাখে। কমলা গ্লাশে জল ঢেলে দেয় ঠাকুর ভাত নিয়ে আসে।

এবং যতক্ষণ না দুই বন্ধুর খাওয়া শেষ হয় জলের মাগ্ হাতে কমলা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। পাতের ভাত শেষ হলে হাঁক দেয় ঠাকুরকে আবার ভাত আনতে।

খাওয়ার পর কমলা দু'জনের হাতে মিঠে পানের খিলি তুলে দেয়।

'আমি আগেই আপনাদের দু'জনের পান এনে রেখেছিলাম। আপনার জর্দা আপনার দোক্তা। আর চূণ লাগবে?' মিষ্টি হেসে কমলা রমেশ ও সতীশের দিকে আর একটি দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'ওয়াণ্ডারফুল মেয়ে, জোয়ারদার, এমন সবমিসিভ আর এমন সুন্দরভাবে সার্ভ করে, মাঝে মাঝে আমরা ভুল বুঝি বটে—' বটব্যালের অধরোষ্ঠ পান ও জর্দার রসে টুস্‌টুস্‌ করছিল।

'খামকা তিনটা দিন তুমি আমার ওপর রাগ ক'রে কাটালে ব্রাদার।' জোয়ারদার বিড়ি ধরিয়ে তারপর জলন্ত কাঠিটা বন্ধুর ঠোঁটের দিকে বাড়িয়ে দেয়। 'আমাদের দু'জনকেই ও সমান চোখে দেখে, দু'জনকেই ও—'

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বটব্যাল বলল, 'বলো, থামলে কেন, দু'জনকেই কমলা—ভালবাসে?'

'ঠিক ভালবাসা না হলেও, ওটাকে ভালবাসা অবশ্য আমি বলতে চাই না, তবে কিনা, যাকে বলে—বয়স তো আর যায়নি, মানে', বন্ধুর কানের কাছে মুখ নিয়ে জোয়ারদার ফিসফিসিয়ে কি একটা সরস কথা বলেই বললে, 'তুমি কি অস্বীকার করতে পার?'

'কে কবে অস্বীকার করতে পেরেছে!' বটব্যাল কড়িকাঠের দিকে চোখ রেখে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। 'সে যুগের বিশ্বামিত্র মুনি থেকে আরম্ভ ক'রে এ যুগের মুনি ঋষিরাও—একি আর আমার কথা, কেতাবে লেখা আছে।'

আজ আর আলাদা নয়, এক বিছানায়, বটব্যালের পাশে শুয়ে জোয়ারদার বন্ধুর সঙ্গে গল্প ক'রে কাটাল। ঘুম এল না কারোর চোখে। কমলার গল্প করতে করতে দু'জন বুঁদ হয়ে রইল।

নিশ্চয়ই, জোয়ারদার সবে কাল চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছে, বটব্যাল পঁয়তাল্লিশ ধরিধরি করলেও এখনো দু'চার মাস বিলম্ব আছে।

হ্যাঁ, বটব্যাল বিগতদার। আজ ছ'বছর। এবং স্ত্রী বিয়োগের পর বাড়ির পুষ্যিসংখ্যা এবং নিজের আয়ের অবস্থা চিন্তা ক'রে আর দার গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। বটব্যালের আফশোষ বিয়ের পর এক দু'মাসের জন্যেও শহরে একটা বাসা ক'রে স্ত্রী নিয়ে বাস করার সুযোগ এই জীবনে পেল না। আর জোয়ারদার, বিয়ে করবে কি, দেশের বাড়িতে বিয়ে-করা বাতব্যাধিগ্রস্ত দাদার বিরাট সংসারের বোঝা টানতেই হাড্ডিচর্মসার হয়ে গেছে সে। ভবিষ্যতে করতে পারবে সেই আশা হালে ছেড়ে দিয়েছে।

সুতরাং তাদের দোষ দেয়া যায় না।

দোষ দেয়া যায় না, যদি রাস্তায় চলতে মেয়েমানুষ দেখে দুই বন্ধু থমকে দাঁড়ায়, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

হ্যাঁ, যেদিকে মেয়েমানুষ চলার সম্ভাবনা থাকে সেদিক ঘেঁসেই তারা বেশি করে হাঁটে।

ট্রামেবাসে, অন্যত্র যদি শূন্য আসনও পড়ে থাকে যেন দেখি না দেখি না ক'রে দু'জন সেদিকে না গিয়ে লেডীজ সীটের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। ড্যালহৌসীর যে-অফিসে মেয়ে কর্মচারীর সংখ্যা বেশি নিজেদের অফিসটি ছুটি হওয়া মাত্র দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করে সোজা সেই অফিসের দরজায় গিয়ে কি ধারে কাছে চায়ের দোকান থাকলে সেখানে ঢুকে পড়ে হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের দেখে। দেখে এবং আলোচনা করে।

নেশা। নেশা বৈকি। সিনেমা কি খেলা দেখা কি বই পড়ার মধ্যে যদি বা প্রথম বয়সে এক আধটু আনন্দ পেত, আশ্চর্য, আজ আর সেসব তাদের মনকে নাড়া দেয় না আকর্ষণ করে না। তা ছাড়া পর্দা কি বইয়ের মেয়েমানুষের চেয়ে রক্তমাংসের মেয়েমানুষের দাম বেশি এই সত্য দিন দিন তারা আরো বেশি উপলব্ধি করছে।

আজ বিকেলে দুই বন্ধু বেড়াতে বেরিয়ে এই আলোচনাই করছিল।

অফিসের আর আর কর্মচারীর কি মেসের ছেলেছোকরার দল সুরাইয়া ও

নাসিমকে দেখতে পাগল। 'ছোঃ!' জোয়ারদার ও বটব্যাল নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি ক'রে পরে গম্ভীর হয়ে বলে, 'তার চেয়ে কমলার দাম আমাদের কাছে লাখগুণ বেশি। কি বলো ব্রাদার।'

রাস্তায় বেরিয়ে মেসের ঝি কমলার গল্প করতে করতে তারা অগ্রসর হয়। কেতাবের উর্বশী ফুলের মালা গাঁথছে কি চাঁদের দিকে তাকিয়ে গান গাইছে সেই দৃশ্যবর্ণনা পড়ার চেয়ে কমলা কলতলায় বসে বাসন মাজছে, ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, যদি অফিস কাছারী না থাকত মেসের ছোঁড়াগুলো না থাকত, তো সারাজীবন দু'জন তাই দেখে কাটিয়ে দিত। এই বাস্তবকাব্যের তুলনা মেলে কোথায়।

'উঁহু এখানে নয় ওখানে।' বটব্যাল জোয়ারদারের বাহু ধরে আকর্ষণ করল।

'কেন এখানে মন্দ কি।' জোয়ারদার অবাক হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকায়।

কার্জন পার্ক। ছুটির দিন বাঙালীপাড়ার পার্কে ডিসপেপশিয়া ও ডায়-বেটিসে ভুগছে সব বাবু আর বেকার ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ে না। তাই তারা সোজা চলে আসে এই অঞ্চলে। ঠোঙা ভর্তি আদা-নুন-তেল-লঙ্কা মাখা মুড়ি কিনে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিল দু'জনে। সেদ্ধ করা খোসা ছাড়ানো চিংড়ি মাছের মতন ফ্যাকাশে রং একটা বাচ্চা পেরাম্বুলেটারে শুয়ে। কালো কুচ্‌কুচে রং, শক্ত সমর্থ আঁট খোঁপা মাথায় মাদ্রাজী আয়া পাশে দাঁড়িয়ে। হাঁ করে কতক্ষণ তা দেখে নিয়ে ঠোঙা থেকে মুড়ি তুলে জোয়ারদার মুখে ফেলতে যাবে, বটব্যালের প্রবল আকর্ষণে হাতের মুড়ি ছিটকে মাটিতে পড়ল। 'এই মন্দ কি, এই তো সবে এলো, দু'পলক দেখে নিই না বাবা, খাসা জিনিস।' খসখসে গলা জোয়ারদারের।

'এ তো শুধু দেখা, উপভোগ্য জিনিস ওদিকে!' বন্ধুর পিঠে এবার আঙুলের খোঁচা মারলে বটব্যাল। 'ওই করবী গাছের পাশে।'

জোয়ারদার ওদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে বন্ধুর কথামত চট্ ক'রে উঠে দাঁড়ায়। এবং সরে গিয়ে ঠিক বেঞ্চিটার সঙ্গে নয়, অন্তত আট দশ হাত দূরে আবার ঘাসের ওপর দু'জনে রুমাল বিছিয়ে বসল।

'জাপানী?' জোয়ারদার ফিসফিসিয়ে বলল।

'চীনা।' বটব্যাল বলল।

'চীনা ও জাপানী তফাৎটা আমি এত বচ্ছর এই শহরে দেখে দেখেও কিন্তু ঠিক মালুম করতে পারি না।'

'তা এক দেশের হলেই হ'ল। তার জন্যে কি। আসল কথা তরুণী। সুন্দরী স্ত্রীলোক।' বটব্যাল একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। তারপর চকচকে জুতো পরা ফুল তোলা রংদার জামা গায়ে ভিন্‌দেশী যুবতীর সবটুকু রূপ যেন দুই চোখ ভরে পান করল। পাশে বসা চীনা যুবকটি যুবতীর ঠোঁটের কাছে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা দিয়ে ওর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে।

'লাভার' জোয়ারদার ফিসফিসিয়ে বলল।

'স্বামী-স্ত্রী হ'তে পারে।' বটব্যাল বলল।

বেশ কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে মুড়িগুলো সাবাড় ক'রে দু'জনে যেন আর কিছু দেখা যায় কিনা সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পার্কের এ-মাথা ও-মাথা জরীপ করতে লাগল।

জোয়ারদার বটব্যালের হাতে চাপ দেয়। 'ওদিকে।' বন্ধুর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দৃশ্যটা দেখতে পেয়েই বটব্যাল চট্‌ করে উঠে দাঁড়ায়। দু'জনে পুবদিকের লোহার বেড়া লাফিয়ে পার হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায়।

আহা কী দৃশ্য! দুই বন্ধুর চোখের পলক পড়ে না।

'কিন্তু সাহেবটা যে বুড়ো।' জোয়ারদার বটব্যালের কানের কাছে মুখ সরিয়ে নেয়।

'পুরুষের বয়স দেখে না মেয়েরা।' বিজ্ঞের মত বটব্যাল উত্তর করল।

'তাও বটে। বয়স কি আমার তোমার কম হয়েছে ব্রাদার।' জোয়ারদার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'মেসে একদঙ্গল ছেলে ছোকরা থাকতে কমলা না হ'লে কি আমাদের দিকে—'

জোয়ারদারের চেয়েও গাঢ়তর একটা নিশ্বাস ছেড়ে বটব্যাল বলল 'তা আর ভাষায় ব্যক্ত করে লাভ নেই, তুষের আগুন যতক্ষণ চাপা থাকে ভাল খুঁচিয়ে বার করতে গেলে শুধু ছাই চোখে পড়ে, বুঝলে না।'

বুঝতে পেরে জোয়ারদার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

পার্কময় মৌসুমী ফুলের মতন ছিটানো মাদ্রাজী চীনা ইংলিশ ওলন্দাজ ফরাসী সিংহলী রূপ দেখা শেষ করে রাত সোওয়া আটটা নাগাদ তারা শ্যামবাজারের বাসে চাপল।

মেসের দরজায় এসে দু'জন থমকে দাঁড়ায়।

ছোটখাটো ভিড়। কি ব্যাপার?

গলা বাড়িয়ে বটব্যাল ও জোয়ারদার প্রশ্ন করল।

'চুরি হয়েছে মেসে।'

'কার ঘরে, কত নম্বর কামরায়?'

'প্রায় সব ঘরেই,' ছেলেরা সমস্বরে বলল, 'আমরা কেউ মেসে ছিলাম না। দল বেঁধে সব সিনেমায় গিয়েছিলাম। ছুটির বিকেল ব'লে ঠাকুর চাকরও বেড়াতে বেরিয়েছিল। ঘরের চাবিগুলো কমলার জিম্মায় রেখে গিয়েছিলাম। আমাদের কাপড় জামা জুতো হাতের কাছে যা পেয়েছে সব নিয়ে ও পালিয়েছে।'

শুনে জোয়ারদার ও বটব্যাল প্রথমটায় চুপ করে থাকে। দুই বন্ধু পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় ক'রে পরে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'থানায় খবর দিয়েছেন কি?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র পুলিশ এসে এন্‌কোয়ারি ক'রে গেছে।'

বটব্যাল ও জোয়ারদার আর কিছু বলল না। নিঃশব্দে গেট্ পার হয়ে ভিতরের বারান্দায় ঢুকল না, সেই জন্যে তারা ভাবছিল না, কেননা বাইরে যাবার সময় ঘরের দরজায় ডবল তালা দিয়ে চাবিটা পকেটে নিয়ে দুই বন্ধু বেরিয়েছিল। তারা কাঁচা ছেলে নয়।

তথাপি দু'জনে, গম্ভীর।

'কি ভাবছ?' বটব্যাল প্রশ্ন করে।

ভাবছি কমলা কেবল কাপড় জামা চুরি করেনি, ভাবের-ঘরেও চুরি ক'রে গেল।' জোয়ারদার বটব্যালের চোখের দিকে তাকায়।

'কি রকম?' বটব্যাল কথাটা চট্ করে বুঝতে পারে না।

'সব ক'টা ছেলের মাথা খেয়ে গেছে কমলা, সবগুলোকে মজিয়েছিল।' জোয়ারদার গম্ভীরভাবে বলল।

'তাই।' এবার আর অর্থটা অস্পষ্ট থাকে না বটব্যালের কাছে, মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বলে, 'না হলে কি আর আহ্লাদ করে সব চাবি ওর হাতে তুলে দেয়।'

'ডেঁপোগুলোর সঙ্গেই ও পীরিত জমিয়েছিল বেশি। আমাদের সঙ্গে যেটুকু করত তা শুধু লোক দেখানো।' রাগে গজগজ করছিল জোয়ারদার।

'তাই,' একটু থেমে পরে বটব্যাল বন্ধুর কথায় সায় দেয়। 'আমাদের তালাবন্ধ ঘরেই সবচেয়ে বড় চুরি হয়ে গেল।'

কিন্তু তাই কি!

দোতলার সিঁড়ি ডিঙিয়ে ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকে দু'জনে অবাক।

এ ঘরেও চোরের হাত পড়েছে। জানালার ধারে পায়াভাঙা টেবিলের ওপর ঘড়িটা নেই।

জোয়ারদার বলল, 'জানালা খোলা ছিল, লাঠি বাঁশ বা-হোক্ কিছু একটা গলিয়ে ওটা সরিয়েছে।'

বটব্যাল নীরব। একটু ভেবে পরে বলল, 'বাসন মাজে জল তোলে, ঘড়ি দিয়ে ও করবে কি, বিক্রী ক'রে দেবে নির্ঘাৎ।'

'উঁহুঁ।' জোয়ারদার মাথা নাড়ল। 'শার্ট পাঞ্জাবি জুতোর যেমন দরকার তেমনি ঘড়িরও দরকার পড়েছে কমলার।'

বটব্যাল ফ্যালফ্যাল ক'রে বন্ধুর মুখের দিকে তাকায়।

'বুঝলে না ব্রাদার,' জোয়ারদার শুকনো হেসে বটব্যালকে বোঝায়, 'ঘড়ি বেঁধে অফিসে যায় এমন লোক জুটিয়েছে হারামজাদী, এ আমি চোখ বুজে বলতে পারি।'

বটব্যাল ধপাস্ ক'রে তক্তপোষের ওপর বসে পড়ল।

'খামকা আমরা দেরি করছিলাম মিছিমিছি ইতস্তত করছিলাম। ঝি কি আর গায়ে লেখা ছিল ওর!'